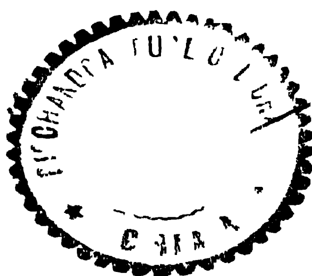
কাঁচা মাটি-পাকা পথ



বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
জন্মাষ্টমী, ১৩৬৬

প্রকাশিকা
অনীতা দেবী
৩১, হরিনাথ দে রোড (স্যুট, ডি-৩১)
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর
কুমারেশ ঘোষ
মন্মথ মুদ্রণী
৪৫এ, গড়পার রোড
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদশিল্পী
চিত্ত সরকার

ব্লক
ক্যালকাটা জব প্রেস (প্রাইভেট) লিমিটেড
কলিকাতা
ব্লক মুদ্রণ
মোহন প্রেস, কলিকাতা-৯

বাঁধাই
ধর ব্রাদার্স
৪, রামমোহন রায় রোড
কলিকাতা-৯

দাম ৪·৫০ ন.প.

৺পিতৃদেবের
স্মৃতিতে

সভ্য সমাজ, শিক্ষা ও আভিজাত্যের দোহাই দিয়ে
অশিক্ষিত, বুনো, গেঁয়ো, সরল, সহজ মানুষগুলোকে
ন্যায্য প্রাপ্য থেকে শেষপর্যন্ত বঞ্চিত করতে পারে কি ?

লেখকের আগামী বই :

মিতবর (পুরস্কার প্রাপ্ত)

আদর্শ বেকার সঙ্ঘ

একটি দিন

বাস্তব

কাঁচা মাটি-পাকা পথ

হীরা ঝড়ের বেগে ছুটে বেরিয়ে যায়। একটা বাঁশের কঞ্চি হাতে নিয়ে কৈলি ছুটে তার পিছু পিছু। হীরা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে। কৈলিও তার গতির বেগ বাড়িয়ে দেয়। হীরা ছুটে এসে সলিলের কাছ ঘেঁসে দাঁড়ায়।

তাকে এমনভাবে ছুটে আসতে দেখে সলিল আশ্চর্য হয়ে যায়।

সে হাত থেকে বইটা নামিয়ে রেখে জিজ্ঞেস করে, ব্যাপার কি?

ব্যাপারটা হীরা খুলে বলবার আগেই কৈলি এসে হাজির হয়। খানিকটা দূরত্ব রক্ষা করে সে দাঁড়ায়। তার মুখের উপর ঘামের বিন্দু ফুটে ওঠে।

বারো বছরের হীরা ষোল বছরের দিদিকে দৌড়ে হারিয়ে দিয়ে বিজয়ীর হাসি হাসে। রাগে ও অপমানে ফুলতে থাকে কৈলি। সলিলের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে তাকায়। ক্রুদ্ধ সর্পিনীর মত গর্জে ওঠে।

• তু বাবুলোগ হামাদের দুষমন আছে।

সলিল দুষ্টুমির হাসি হেসে কৈলির দিকে তাকায়। বাঁশের কঞ্চিটা উঁচিয়ে কৈলি আবার তেড়ে যায় হীরার দিকে।

হীরাকে কোলের কাছে টেনে নেয় সলিল। রাগে ফুলতে থাকে কৈলি।

মিষ্টি হেসে সলিল বলে, মারবে, আমাকে মারো। সঙ্গে সঙ্গে সে নিজের পিঠটা দেখিয়ে দেয়।

মুহূর্তের মধ্যে বদলে যায় কৈলির চেহারাটা। উদ্যত কঞ্চিখানা নামিয়ে নিয়ে খিল খিল করে হেসে ওঠে সে। সলিল ছেড়ে দেয় হীরাকে।

কেলি হীরার হাতটা খপ করে ধরে। তাকে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যায় তাদের ডেরার দিকে। যাবার সময় ঘাড় বাঁকিয়ে একবার দেখে নেয় সলিলকে।

কেলি ও হীরা চলে যেতেই সলিল নিস্পৃহভাবে বসে থাকে চেয়ারটার উপর। তার মনের আনাচে ঘুরে ফিরে কেলির মরাল দৃষ্টি, কাচ পোকার টিপ পরা ছোট্ট কপাল ও নিটোল মুখখানা। রাগলে তাকে বেশ দেখায়। হঠাৎ বনবিহারীর ডাক তার কানে আসে।

এখন উঠে পড়ো, হিম পড়চে।

সলিল আজ কদিন হলো ময়নাপাড়ায় এসে লালকুঠিতে উঠেছে, বলতে গেলে বনবিহারীর অমতেই। বনবিহারীর ইচ্ছা ছিল শহরের আশে পাশে কোথাও বাসা নেয়।

সলিল খুঁজছিলো তার মনের মতন শান্ত নির্জন পরিবেশের মধ্যে একটু আস্তানা। অনেক খুঁজে খুঁজে সে আবিষ্কার করেছে এই ময়নাপাড়া। জায়গাটা ভাল লাগার বিশেষ কারণ হচ্ছে সাঁওতাল পরগণার এই পল্লী যেন সভ্য জগতের ছোঁয়া বাঁচিয়ে আজও তার কৌলিন্য বজায় রাখতে পেরেছে।

সকাল-বিকেল সলিল লালকুঠির বাইরে খোলা জায়গায় এসে বসে। কখনও বই পড়ে। আবার কখনও সে বনবিহারীকে ডেকে গল্প করে। এই বন্ধু-বান্ধবহীন ময়নাপাড়ায় বনবিহারীই তার পারিষদ ও ভৃত্য। একদিন সে বনবিহারীকে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা, বিহারীদা, তোমার জায়গাটা পছন্দ হয়েছে?

মোটেই না। চারদিকে ঝোপ জঙ্গল, জানোয়ারের বাস। মনে হলেই গা ছমছম করে ওঠে।

হেসে ওঠে সলিল বনবিহারীর কথা শুনে।

জানোয়ার কোথায় দেখলে?

ওই সাঁওতালগুলো জানোয়ার ছাড়া আর কি?

ভুল বুঝেছ তুমি, ওরা শিশুর মত সরল।

তাদের আরেকটা স্বরূপ দেখনি ছোটবাবু। কখনও কখনও ওরা হিংস্র জানোয়ারের মত ভয়ঙ্কর। জানোয়ারের সঙ্গে ওদের বিশেষ তফাত নেই।

মনে পড়ে সলিলের হীরার দিদির কথা। কি ভয়ঙ্কর হিংস্রভাব ফুটে উঠেছিল তার চোখেমুখে সেদিন।

খানিকক্ষণ কি একটু ভেবে নিয়ে বনবিহারী বলে, এমন জায়গাই বেছে নিলে ছোটবাবু, দুকোশ পথের মধ্যে একটা দোকানপাট নেই, ডাক্তারখানা নেই, যদি অসুখ হয়?

অসুখ হলে তখন দেখা যাবে।

কলকাতা থেকে আসবার সময় সলিল কিছু প্রয়োজনায় ওসুধপত্র ও খানকয়েক বই নিয়ে এসেছে। আর এনেছে কয়েক বাক্স লজেন্স। মাঝে মাঝে সে এগুলো ছোট ছোট সাঁওতাল ছেলেমেয়েদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়। তারা কাড়াকাড়ি করে। সে বসে বসে দৃশ্যটা উপভোগ করে। হীরাও আসে অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে লজেন্স কুড়োতে। তার সমবয়সীরা তার সঙ্গে শক্তিতে আঁটতে পারে না। তাকে দেখে সলিলের মনে হয় যেন একটা খাপ খোলা বাঁকা তলোয়ার। কাছে ডেকে সলিল তার হাত ভর্তি করে লজেন্স বিস্কুট দেয়। সে লাফাতে লাফাতে চলে যায়।

হীরা সলিলের ফর্সা সুন্দর চেহারা দেখে তার নাম করণ করেছে রাঙাবাবু। এই নামেই সলিল সাঁওতাল ছেলেমেয়েদের মধ্যে পরিচিত। কৈলির কানেও তার নামটা এসেছে। তার ধারণা রাঙাবাবু ছেলেমেয়েদের রকমারী জিনিস দিয়ে লোভ দেখায়। তাই সে সেদিন বারণ করেছিল হীরাকে রাঙাবাবুর

কাছে না ঘেঁসতে। তার কাছে কোন জিনিসের জন্য হাত না পাততে। হীরা তার কথা শোনে না। প্রায়ই বিস্কুটটা লজেন্সটা নিয়ে আসে। তাকে দেখিয়ে দেখিয়ে খায়। কৈলি ভয় দেখায় লজেন্সে বিষ থাকতে পারে, ওষুধ থাকতে পারে। মতলব ছাড়া রাঙাবাবু এমনি তাকে জিনিসগুলো দেয় না। কিন্তু নির্ভীক হীরা দিদির কথায় আমল দেয় না। তার দৃঢ় বিশ্বাস, অমন সুন্দর দেবতার মতন লোক কখনও খারাপ হতে পারে না। দিদি নিশ্চয়ই হিংসা করে তাকে, তাই এসব যা তা বলে।

হীরা সলিলকে জানায়, লালকুঠির লোকদের কেউ বিশ্বাস করে না। সবাই ভয় করে। তারা শহরের লোক, যা তা অত্যাচার করে, তাই কেউ ভয়ে কাছে ঘেঁসে না। তার কিন্তু ভয় করে না। সলিল হীরাকে বুঝায়, মানুষ মানুষকে কেন ভয় করবে।

কথাটা ভাল লাগে হীরার। তার উৎসাহ আর সাহস দুই-ই যেন দ্বিগুণ বেড়ে যায়। সে সুযোগ পেলেই ছুটে আসে সলিলের কাছে। তার বন্ধুরা দূরে দাঁড়িয়ে দেখে তার সাহসটা। তারা বানিয়ে বানিয়ে অনেক কথা তোলে হীরার দিদির কানে। কৈলি ভয়ে আতঙ্কে শিউরে উঠে। সে তার বাপকে জানায় হীরার কথা, রাঙাবাবুর কথা।

সর্দার মাঝি মেয়ের কথা শুনে হাসে।

লালকুঠির একটা ইতিহাস আছে। জমিদারী প্রথা যখন কায়েম ছিল, তখন জমিদারের কর্মচারিগণ এখানে এসে উঠত। খাজনা আদায় উসুল করে, কাজকর্ম সেরে তারা ফিরে যেত শহরে। কিন্তু পেছনে রেখে যেত তাদের অপকীর্তির ইতিহাস।

জমিদারী প্রথা উঠে যাওয়ার পর থেকে আর কেউ আসে না এদিকে। সাঁওতালরাও বেঁচে যায় অত্যাচারের হাত থেকে।

এখন সদরে গিয়ে খাজনা দিয়ে আসে তারা নির্দিষ্ট তারিখ মত।

কিন্তু লালকুঠির দিকে তাকালে এখনও সাঁওতালদের বুকের রক্ত যেন ভয়ে জমে আসে। অত্যাচারের ছবিগুলো ভেসে ওঠে তাদের মনের পটে। আঁতকে ওঠে তারা। স্থির করে শহরের বাবুদের আর আমল দেবে না।

এতদিন পর লালকুঠিতে আবার শহরের বাবুকে আসতে দেখে সাঁওতালবা অসন্তুষ্ট হয় মনে মনে। অভিসম্পাত করে সর্দার মাঝি শঙ্কুকে। তাদের ধারণা সেই রাঙাবাবুকে ঢুকিয়েছে এ বাড়ীতে মোটা বখশিশের লোভে। কিন্তু প্রকাশ্যে তারা সর্দার মাঝিকে কিছু বলে না। সবাই তাকে ভয় করে, সমীহ করে। তাদের বিপদে আপদে সর্দার মাঝিই এগিয়ে যায়, বুদ্ধি যোগায়, প্রাণ ও মান বাঁচায়।

চারখানা সাদা ধবধবে দেওয়ালের মাথার উপর লাল টক-টকে রঙের টালির ছাদ। লালকুঠি যেন মাথায় রাজমুকুট পরে সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে। দূর থেকে ভারী সুন্দর দেখায় লালকুঠিকে।

ধীরে ধীরে বনবিহারীর কানেও আসে এই লালকুঠির ইতিহাস। সে সলিলকে একদিন অনুরোধ জানায়।

চল ছোটবাবু, অন্য কোথাও যাই। বড্ড ভয় করে এখানে। যদি এরা কোনদিন আক্রমণ করে।

সলিল সশব্দে হেসে ওঠে বনবিহারীর কথা শুনে। তারপর বলে, এরা সাপের মত, না খোঁচালে ফোঁস করে ওঠে না।

কিন্তু একবার ফোঁস করে উঠলে আর বাগ মানানো যায় না। বনবিহারী তার নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলে। কিন্তু ঘটনাটা সে চেপে যায়।

সে সলিলকে ছেড়ে যেতে পারে না। এই মা মরা ছেলেকে সে শিশুবেলা থেকে মানুষ করে আসছে। ইদানীং ডাক্তারী পরীক্ষার খাটুনিতে সলিলের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যায়। তাই বনবিহারী তাকে বলে কয়ে নিয়ে এসেছে লুপ্ত স্বাস্থ্য উদ্ধারের আশায় এই সাঁওতাল পরগণায়। কিন্তু জায়গাটা বেছে নিয়েছে সলিল নিজেই। শহরের ঘিঞ্জিব মধ্যে সে যেন হাঁপিয়ে উঠেছিল।

সেদিন সলিল আর বনবিহারীর মধ্যে কথা হচ্ছিল। বনবিহারী রান্না ঘরে আর সলিল বাইরে দবজাব কাছে দাঁড়িয়ে। সলিল বলে, তোমার মত বেরসিক ও বেহেড লোক আব দুটি নেই।

বেরসিক বুঝলুম, কিন্তু বেহেড কি ছোটবাবু ?

বেহেড বুঝলে না ?

না।

যেমন ধর বেগুণ কথাটা। মানে হচ্ছে যার কোন গুণ নেই, ঠিক তেমনি বেহেড হচ্ছে, মাথা নেই।

বনবিহারী তার নিজেব মাথাটা দেখিয়ে বলে, এই তো দিব্যি রয়েছে।

খোলটা রয়েছে কিন্তু ভেতবের সারটুকু নেই।

মিথ্যে বলোনি ছোটবাবু, তা যদি থাকতো তাহলে তোমাকে আগলে পড়ে থাকতাম না এই তেইশটা বছর।

বনবিহারী বিড়বিড় করতে করতে জলচৌকিটা এগিয়ে দেয়।

ভেতরে এসে বস, নইলে ঠাণ্ডা লেগে সর্দি হবে। আমার হয়েছে যত জ্বালা!

কথাটা শেষ করে নিজেই সে সজোরে হেঁচে ওঠে।

সলিল হেসে উঠে।

ঠাণ্ডা লাগলো আমার, আর হাঁচি এলো তোমার।

এই কথার উত্তর না দিয়ে বনবিহারী সজোরে ময়দা মাখতে থাকে। ময়দা মাখতে মাখতে সে সলিলকে উদ্দেশ করে বলে, তোমার পেছুলাগা স্বভাব ও মেজাজ আমি ঠাণ্ডা করতে জানি। ভেবেছ কি ?

বলেই সে অজ্ঞাতসারে বেশ খানিকটা জল ঢেলে দেয় ময়দার মধ্যে। থালা থেকে জল উপচে পড়ে। কাণ্ডটা দেখে আবার সশব্দে হেসে ওঠে সলিল।

কাকে ঠাণ্ডা বানাতে গিয়ে কাকে বানালে বিহারীদা।

বনবিহারী মুহূর্তের মধ্যে একগাদা ময়দা ঢেলে দেয় থালায়। হাসতে হাসতে সলিল সরে পড়ে।

আধঘণ্টাটাক পরে বনবিহারীর হাঁক শোনা যায়। খেয়ে এসে আমায় উদ্ধার করে যাও।

শান্ত সুবোধ বালকের মত সলিল এসে বসে আসনটার উপর। গামলার উপর সগুভাজা একরাশ লুচি চোখে পড়তেই সে জিজ্ঞেস করে—

অত কে খাবে ?

মুখ খিঁচিয়ে বনবিহারী বলে, কেন আমি খেতে জানিনে ? আমি কি মানুষ নই।

সলিল নরম সুরে বলে, আমার ঘাট হয়েছে।

বনবিহারী রাগে গজ গজ করতে থাকে।

আর পারিনে বাপু, কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি আবার আমার উপরই তম্বি !

বনবিহারীকে রাগাতে সলিল মজা পায়।

এবার দেখছি ঘরে একটা বউ আনতেই হবে। পরের টা আর সহ্য হয় না।

হঠাৎ একগাদা লুচি এনে বনবিহারী তার পাতে ঢেলে দেয়। সলিল চেঁচিয়ে ওঠে।

একি হচ্ছে ?

খাও, পেট ভরে খাও। নইলে বউ এলে তার কাছে লাগাবে, বিহারী আমাকে খেতে দেয়নি।

প্রায়ই মনিব ভৃত্যের মধ্যে এরকম কৃত্রিম ঝগড়া হয়। মিটেও যায় অতি সহজে।

সন্ধ্যার আধো আলো আধো অন্ধকারে শাল বনের মাঝখান দিয়ে মেটে লাল রঙের পথটা ধরে চলতে সলিলের ভাল লাগে। সাঁওতালরা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে তার দিকে। খানিকক্ষণ হেঁটে বেড়িয়ে ফিরে আসে সে। অবসর সময়টা কখনও বই পড়ে আবার কখনও ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের খেলা ও ঝগড়া উপভোগ করে। খেলার শেষে শিশুর দল অদূরে দাঁড়িয়ে বখশিশের জন্যে হাত বাড়ায় কিন্তু কাছে আসে না।

হীরার ইচ্ছা তার দিদিও চকোলেটের স্বাদটা উপভোগ করে। তাই সে একদিন একটা চকোলেট পূরে দেয় তার মুখে।

প্রথমটা কৈলি থুক থুক করে ফেলে দেয় মুখ থেকে চকোলেটটা। কিন্তু ফেলে দেওয়ার পরও চকোলেটের গলিত অংশটুকু তার জিহ্বায় যেন একটা অদ্ভুত স্বাদ যোগায়। সে একটা ঢোক গিলে নিয়ে আর একটার জন্যে হাত বাড়ায়। হীরা সোৎসাহে আর একটা দিদির হাতে দেয়। কৈলি চিবিয়ে খেয়ে ফেলে। হীরা বলে, চিবিয়ে খেতে নেই, চুষে চুষে খেতে হয়। পরপর কয়েকদিন খেয়ে কৈলি যখন দেখে কোন বিষক্রিয়া অথবা নেশার উদ্রেক হয় না, তখন সে নিশ্চিন্ত হয় যে রাঙাবাবু লোকটা বদমতলবের নয়। হীরাকে

সে বারবার সাবধান করে দেয় সে যেন তার লজেন্স ও চকোলেট খাওয়ার কথাটা ফাঁস না করে দেয়।

হীরা প্রতিশ্রুতি দেয় সে কখনও কাউকে বলবে না। এমন কি রাঙাবাবুকেও নয়। হীরার চোখে মুখে একটা তৃপ্তি ও গর্বের ভাব ফুটে ওঠে। সে এতদিনে দিদির ভুলটা ভাঙ্গাতে পেরেছে।

অন্যান্য দিনের মত সলিল বাইরে এসে বসে। হঠাৎ তার চোখে পড়ে একটা মেটে রঙের কলসী মাথায় নিয়ে কৈলি দাঁড়িয়ে কলতলায়। সলিলের কৌতূহল বেড়ে যায়।

কৈলি কলসীটাকে টিউবওয়েলের মুখের নীচে রাখে। তারপর শাড়ীটাকে গাছ-কোমর করে পরে নেয়। এই টিউবওয়েলটা থেকে বনবিহারী সেদিন শত চেষ্টা করেও একফোঁটা জল বার করতে পারেনি। সলিল নিজেও চেষ্টার ত্রুটি করেনি। কাজেই টিউবওয়েলটার সাথে কৈলির যুদ্ধটা উপভোগ করার জন্য তাকিয়ে থাকে সে।

কৈলির সবল হাতেব চাপ কলটা যেন সহ্য করতে পারে না। এক এক ঝলকে খানিকটা জল বেরিয়ে আসে তার গলা থেকে। সে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে। কৈলি অ'প্রাণ যুঝে চলে টিউবওয়েলটার সঙ্গে। দরদর করে ঘাম বেরিয়ে আসে তার কপাল ও মুখ থেকে। ধীরে ধীরে তার আঁটসাঁট শাড়ীটা ঢিলে হয়ে পড়ে। বুকের কাপড় আলগা হয়ে যায়! কাঁধ থেকে সরে যায় শাড়ীর একটা অংশ। তার অনাবৃত কাঁধ ও বাহু যেন এক সামিল হয়ে যায়, আরো চোখে পড়ে তার পুষ্ট স্তনদুটির ওঠানামা।

কিন্তু কৈলির সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। সে যুঝতেই থাকে কলটার সঙ্গে।

সলিলের বিবেক থেকে থেকে তাকে কশাঘাত করে। তার দৃষ্টিটাকে ফিরিয়ে নিতে বলে। কিন্তু কৈলির যৌবনের আকর্ষণী

শক্তি, অর্ধোন্মুক্ত দেহ সলিলের চোখ দুটোকে যেন জাহাজের কম্পাসের মত উত্তরমুখী করে রাখে। তার চোখে যেন ধরা দেয় অজন্তা ইলোরার জীবন্ত মূর্তি।

প্রচণ্ড সংগ্রামের পর কৈলি নীচু হয়ে কলসীটাকে পরীক্ষা করে দেখে জলের পরিমাণটা। সঙ্গে সঙ্গে আরও ঢিলে হয়ে পড়ে তার বুকের দি'কর কাপড়টা। যৌবনের প্রতীক দুটি আরও স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয় সলিলের চোখে। তার শরীরের মধ্যে যেন হঠাৎ বিদ্যুৎ খেলে যায়। মন্ত্রমুগ্ধের মত সে চেয়ে থাকে ওদিকে।

আধ কলসী জল দেখে বিরক্ত হয় কৈলি। বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে সে তাকায় টিউবওয়েলটার দিকে। তারপর চাবদিক দেখে নিয়ে ঢিলে শাড়ীটাকে আঁট-সাঁট করে পরে নেয়।

ভাগ্যিস কলতলা থেকে সরাসরি সলিলকে দেখতে পাওয়া যায় না। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সলিল।

কৈলি লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে আসে মেটে লাল রাস্তাটা ধরে। লালকুঠির কাছ ঘেঁসে রাস্তাটা বাঁক ফিরে গিয়েছে। বাঁক ঘুরতেই কৈলির চোখে পড়ে সলিলকে। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে সে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নেয় তাকে; তারপর ত্রস্তে পা ফেলে বাঁকের শেষে মিলিয়ে যায়।

সলিল লক্ষ্য করে, কৈলির দেহের জৌলুষ যেন ফুটে বেরুচ্ছে। তার চলার মরাল ভঙ্গি ও চাহনি সলিলের শান্ত মনে যেন সমুদ্রের আলোড়ন সৃষ্টি করে।

সেদিন হীরাকে দেখতে পেয়ে সলিল বলে, সর্দারকে বলিস, আমার সঙ্গে দেখা করতে, জরুরী কথা আছে।

হীরার মুখে খবর পেয়ে শঙ্কু মাঝি এসে হাজির হয়। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সে সলিলের দিকে তাকায়।

সলিল বলে, বনবিহারীর অসুখ হয়েছে। একজন লোকের

দরকার, রান্নাবান্না, বাসন মাজা ও জল তোলার জন্যে।

সর্দার উত্তরে বলে, বাবু হামাদের রান্না তুদের না ভালো লাগবে।

বাটনা, কুটনো ও বাসন মাজতে পারে এমন একজন হলেই হবে। রান্নাটা আমি নিজেই করে নেবো।

কয়েক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে সর্দার সম্মতি জানায়, হামার বিটি মদদ্ দিবে। উ সব কাম ঠিক করে লিবে।

প্রয়োজনের গুরুত্ব চিন্তা করে সলিল আর আপত্তি করে না।

প্রথমটা কৈলি লালকুঠিতে আসতে রাজী হয়নি। বাপের ধমকে শেষে রাজী হয় সে।

পরদিন সকালে কৈলি আসে হীরাকে সঙ্গে নিয়ে।

রান্নাঘরে বাসনের শব্দ শুনে বনবিহারী চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করে, রান্নাঘরে কে?

সলিল জানায় কৈলি ও হীরা এসেছে কাজ করতে। বনবিহারী কাঁপতে কাঁপতে উঠে আসে। রান্নাঘরে ঢুকে সে কৈলিকে ধমক দেয়, তোদের কিচ্ছু করতে হবে না। বাড়ী পালা।

• তাদের তাড়িয়ে দিয়ে বনবিহারী গজগজ করতে থাকে। সলিলকে উদ্দেশ করে চেঁচিয়ে বলে, একদিন বিছানায় পড়ে থাকলে বাবুর চলে না। মুখে শুধু বক্তৃতা।

কথার খোঁচাটা সলিলের মনে লাগে।

পারিই তো, বলেই সে স্টোভ বার করে।

সর্দার মাঝি কৈলিকে বলে দিয়েছিল, সব কাজ করে দিয়ে সে যেন আসে। কিন্তু বনবিহারী তাকে কাজ করতে দেয়নি। বাবার কাছে কি কৈফিয়ৎ দেবে তাই ভাবছিল কৈলি। হঠাৎ তার খেয়াল হলো, দেখা যাক রাঙাবাবু কি করে। বাইরের জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখে সে। তার পাশ ঘেঁসে দাঁড়ায় হীরা।

সলিল ষ্টোভটার নাভিদেশে একটু স্পিরিট ঢেলে দেয়। ম্যাচ

বাক্সটা পকেট থেকে বার করে সে। জ্বলন্ত কাঠির ছোঁয়া লেগে দপ করে জ্বলে ওঠে আগুন। ধীরে ধীরে ষ্টোভের উপরের চাকতিটার ফাঁকে ফাঁকে দেখা দেয় সবুজ ও লাল রঙের আলো। শেষে আলোর সবুজ আভাটা মিলিয়ে যায়। লাল টকটকে রঙটা ফুটে ওঠে। কী সুন্দর দেখায়। বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে কৈলি ও হীরা। পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়। লোকটা নিশ্চয়ই যাদু জানে। দু'ভাই বোনে মিলে ফিস্‌ফিস্ করে গবেষণা করে। কী করে এটা সম্ভব হলো! জীবনে তারা এই প্রথম দেখে কলের উনুন। এর আগে কৈলি একবার চোরাবাতি দেখেছিল জমিদারের কর্মচারীর হাতে। তখন সে নেহাত ছোট্ট ছিল। টিপ দিলেই জ্বলে ওঠে সেই চোরাবাতি। যখন খুসী জ্বালানো যায়, নিভানো যায়। কেরোসিন লাগে না, সলতের দরকার হয় না, কিন্তু তার চেয়েও এটা আরো আশ্চর্যজনক। কাঠ ও কয়লা ছাড়া ধরে যায় এই অদ্ভুত উনুনটা। তারা বাড়ী ফিরে মায়ের কাছে সবিস্তারে বর্ণনা করে আশ্চর্য উনুনটার কথা। মা শুনে বিশ্বাস করে না।

ইটা ঝুট আছে। হামার বিশ্বাস না হয়।

সর্দার বাড়ী ফিরতেই তারা ভাই বোনে তাকে ষ্টোভটার কথা বলে।

সর্দার হেসে বলে, ইটা ঝুট না আছে। কল সব কুছ করতে পারে।

বনবিহারী ইচ্ছা করেই কৈলির সাহায্য নেয়নি। কারণ হয়ত এর জন্য তার সমাজে কৈফিয়ৎ দিতে হতে পারে। মাঝিদের সমাজে এই নিয়ে কথা হতে পারে। তাছাড়া আরও একটা কথা ভাবে সে। মনটা মুসড়ে পড়ে তার। সে জানে লালকুঠির উপর

মাঝিদের আক্রোশ আছে। এর কোন কাজে কেউ সহযোগিতা করুক, অনেকেই তা চায় না।

আজ ক'দিন বনবিহারীর জ্বর সেরে গেছে। তার মনে পড়ে সেদিন সে কৈলির প্রতি রূঢ় ব্যবহার করে ফেলেছে। সে মনে মনে অনুতপ্ত হয়। মেয়েটার তো কোন দোষ নেই। সে সর্দারের নির্দেশে তাদেরই প্রয়োজনে সাহায্য করতে এসেছিল।

সকালে পাতকুয়ো থেকে জল আনতে গিয়ে বনবিহারীর দেখা হয় কৈলির সঙ্গে। বনবিহারীকে দেখে ইচ্ছা করেই কৈলি মুখ ঘুরিয়ে নেয়। যেন সে দেখতে পায়নি। বনবিহারী বুঝে, সেদিনকার তাড়িয়ে দেওয়ার প্রতিক্রিয়া। সে নরম স্বরে কৈলিকে জিজ্ঞেস করে, রাগ করেছিস বুড়োর উপরে? তখন মেজাজটা আমার ভাল ছিল নারে। অনুতাপের আভাষ ফুটে ওঠে তার কণ্ঠস্বরে। কৈলি ঘুরে দাঁড়ায়।

তু হামাকে গাল দিলে কেনে? হামার গোসা হবে না কেনে? হামি জানোয়ার না আছে।

আর গাল দেবো না। তোর যখন খুসী আসবি।

খুসীতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে কৈলির চোখমুখ। তার সরল ব্যবহারে মুগ্ধ হয় বনবিহারী। ধীরে ধীরে তার প্রতি স্নেহের দানা বেঁধে ওঠে

লালকুঠিতে আসতে কৈলি আগের মত এখন আর সঙ্কোচ বোধ করে না। বনবিহারী তাকে দিয়ে এখন ছোটখাট ফরমাশ খাটায়। জল আনানো, বাটনা বাটানো; এবং তার বিনিময়ে তাকে বখশিশ দেয়, ভাজা বড়া। শিখিয়ে দেয় ভেজিটেবিল চপ, মাছ-মাংসের চপ, পায়েস পিঠে তৈরি করা। কৈলি অনুকরণ করে বেশ তাড়াতাড়ি আশাতীত ভাবে।

বনবিহারী আশ্চর্য হয়ে যায় তার অনুকরণ শক্তি দেখে। তার ধারণা ধীরে ধীরে পাল্টে যায়। আগের মত তাচ্ছিল্যভাব আর দেখায় না। জংলী বলে মন্তব্য করে না।

কৈলির চোখে যেন একটা নতুন জগৎ ফুটে ওঠে। ধীরে ধীরে তার আস্থা ফিরে আসে শহুরেদের উপর।

প্রথম প্রথম চপ পায়েস ইত্যাদি সুখাদ্য তার কড়া জিহ্বার আস্তর ভেদ ক'রে যেন স্বাদ যোগাতে পারতো না। এখন সে স্বাদ পায়। দ্বিগুণ উৎসাহে ফরমাশ খাটে ভাজা ও বড়ার আশায়। জিনিসগুলো সে একা খায় না, বাড়ীও নিয়ে যায় না। হীরা ও সে দুজনে শাল গাছের নীচে বসে তৃপ্তি করে খায়। তারপর ঝিলের জল খেয়ে বাড়ী ফিরে। ব্যাপারটা গোপন রাখে কৈলি ও হীরা নিজেদের মধ্যে। সাঁওতাল মাঝির সমাজে জানলে নানা কথা উঠবে। হয়ত কৈফিয়ৎ চাইবে। তাই কৈলি সব সময় সন্ত্রস্ত থাকে হীরাকেও সাবধান করে দেয় সে।

এখন কৈলিকে দেখতে হলে সলিলকে আর লুকিয়ে দেখতে হয় না। সে প্রায়ই বনবিহারীর কাছে আসে এবং সুযোগ পেলেই উঁকি মেরে দেখে সলিলকে। কিন্তু কথা বলে না। সলিল কাছে পেয়ে কৈলিকে ভাল করে লক্ষ্য করে।

কৈলির গায়ের রংটা আর দশটা সাঁওতাল মেয়ের মত নয়। কালোর উপর যেন একটা নীলের ছোপ রয়েছে এবং এই জন্যই তার দেহের লাবণ্যটা যেন আরো বেশী ফুটে উঠেছে। কালোরও যে একটা রূপ আছে সলিল মনে প্রাণে অনুভব করে।

কালোর রূপ নিয়ে অনেক তর্ক হয়েছে ইলার সঙ্গে তার। সে প্রমাণ করতে চেয়েছে কালোরও রূপ আছে কিন্তু ইলা হেসে উড়িয়ে দিয়েছে তার যুক্তি।

কালো রঙই সৌন্দর্যের একটা খুঁত।

অগত্যা সলিল আরও যুক্তি দেখায়।

স্বাস্থ্যই দেহের সৌন্দর্য।

তাও স্বীকার করে না ইলা।

স্বাস্থ্যের সঙ্গে চাই নিখুঁত গড়ন, ফর্সা রঙ, সুন্দর মুখশ্রী। সুন্দর মানে সর্বতোভাবে সুন্দর। সলিল শেষে যুক্তিতে আঁটতে না পেরে বলে, নিজের রঙ ফর্সা কিনা, তাই কালো রঙ সহ্য করতে পার না।

ইলা হেসে উত্তর দেয়, তোমার কালোর প্রতি প্রীতির হেতুটা আমি খুঁজে পাই না। তুমি নিজেও কম ফর্সা নও। উত্তরে সলিল নীরবে হাসে।

সলিল প্রায়ই আবৃত্তি করে তার প্রিয় 'কৃষ্ণকলি' কবিতাটি। 'কৃষ্ণকলি তার কল্পলোকের মানস-প্রিয়া। ময়নাপাড়ায় সে যেন জীবন্ত হয়ে দেখা দিয়েছে তার চোখে। কিন্তু ধরা দিয়েও সে দেয় না। আড় চোখে আঁখিবাণে তাকে বিদ্ধ করে। বনহরিণী পালিয়ে পালিয়ে যায়।

সলিল বসে থাকে পথের দিকে চেয়ে বনহরিণীর প্রত্যাশায়।

সেদিন সলিল একা ঘরে পাইচারী করতে করতে আবৃত্তি করে 'কৃষ্ণকলি'।

কৈলি কি একটা কাজে এদিকে আসে। হঠাৎ জানলা দিয়ে কৌতূহলবশতঃ তাকাতেই সে দেখে রাঙাবাবু কি যেন চেঁচিয়ে বলছে আর ঘন ঘন পাইচারী করছে। তার মনে হলো রাঙাবাবুর বোধহয় মাথা খারাপ হয়েছে। সে ঘুরে এসে রান্নাঘরের দাওয়ায় দাঁড়ায়। দুশ্চিন্তার রেখা তার কপালে ফুটে ওঠে। সে বনবিহারীকে জিজ্ঞেস করে, রাঙাবাবু চিল্লাচ্ছে কেনে? পাগল হইছে কি?

বিহারী কোন রকমে হাসি চেপে য ।

বোধহয় পাগল হয়ে গেছে।

আতঙ্কে শিউরে ওঠে কৈলি। অনুকম্পায় ভরে ওঠে তার মন। ঠাকুরের মত আগুনপারা রঙ, সুন্দর চেহারা হঠাৎ এমন হলো কেন? নিশ্চয়ই কোন জিন্ তার কাঁধে ভর করেছে। কি একটু ভেবে নিয়ে সে বনবিহারীকে বলে, বুড়া, অখন তু কী করবে?

দড়ি দিয়ে বেঁধে পুলিশের ফাঁড়িতে নিয়ে যাবো। শুনে কৈলির গলার স্বর যেন বুজে আসে। সে পথ বাতলে দেয়—

লছমীর বাবা অষুধ জানে। বিলকুল ভাল হবে রাঙাবাবু।

বনবিহারী দেখলো রসিকতাটা আর বাড়তে দেওয়া উচিত নয়। সে চেঁচিয়ে ডাকে, ছোটবাবু।

সলিল যেন আত্মস্থ হয়ে গিয়েছে তার আবৃত্তির মধ্যে। হঠাৎ বনবিহারীর ডাকে আবৃত্তিটা মধ্যপথে বাধা পায়। সে গজগজ করতে করতে রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে আসে। মন্তব্য করে, একেবারে বেরসিক।

সলিলকে দেখে কৈলি দু'পা পিছিয়ে যায়। ভালো করে লক্ষ্য করে তার চোখ-মুখ, পাগলের লক্ষণ আছে কি না!

বনবিহারী সলিলকে বলে, তোমাকে আবৃত্তি করতে শুনে কৈলি মনে করেছে তোমার বুঝি মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

হো হো করে সশব্দে হেসে ওঠে সলিল। হাসিতে তার বনবিহারীও যোগ দেয়।

কৈলি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এতক্ষণে সে তার ভুল বুঝতে পারে। রাঙাবাবু হয়ত মন্ত্রতন্ত্র কিছু পড়ছিল। সে সঙ্কোচ বোধ করে দাঁড়িয়ে থাকতে সলিলের সম্মুখে। তাই সে হঠাৎ ছুটে পালিয়ে যায় তার বাড়ির দিকে।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে সলিল তাকিয়ে থাকে কৈলির অপস্যয়মান দেহটার দিকে।

বনবিহারীর গলা খাঁকারিতে তার দৃষ্টি ফিরে আসে।

বনবিহারী জিজ্ঞেস করে, আর ক'দিন জঙ্গলে পড়ে থাকবে শুনি ?

হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নের কারণটা গোপন থাকে না সলিলের কাছে। সে নির্লিপ্তভাবে জবাব দেয়, যতদিন না আমার শরীর সারে।

বনবিহারী আর কথা বাড়ায় না। সে মনে মনে বলে, সব বয়সের দোষ। কিন্তু প্রকাশ্যে বলে, জংলীদের বেশী আমল দিতে নেই।

সলিলের মুখে বিরক্তির ভাব ফুটে ওঠে।

তোমার মন নোংরা। কদর্য তোমার ইঙ্গিত।

নরমস্বরে বনবিহারী উত্তর দেয়, আমি চাকর, অশিক্ষিত মূর্খ।

উত্তেজিত হয়ে ওঠে সলিল।

চাকরকে চাকরের মতই থাকা উচিত।

বেত্রাহতের মত কেঁপে ওঠে বনবিহারী। দুঃখে অভিমানে সে ভেঙ্গে পড়ে। কিন্তু অভিসম্পাত দেয় না সে সলিলকে। অপত্যস্নেহে কোলে পিঠে করে সে তাকে মানুষ করেছে। মনে পড়ে তার রায়-পরিবারে আসার কাহিনীটা। সলিলের পিতা ডাঃ সুবিনয় রায়ের খাস চাপরাশী হয়ে সে প্রথম সরকারী চাকরিতে ঢোকে। ডাঃ রায় তখন সিভিল সার্জেন।

সলিল যখন দু-বছরের শিশু, তার মা মারা যান। মৃত্যুশয্যায় তিনি বনবিহারীর উপরেই খোকার দেখাশোনার ভার দিয়ে যান। সেই থেকে বনবিহারী সলিলকে যখের ধনের মত আগলে আছে। এক দিনের জন্যেও কাছ ছাড়া হয়নি। চাকরি থেকে অবসর নিয়ে অবধি সে এই রায় পরিবারেই আছে। ডাঃ রায় সাংসারিক বিষয়ে বনবিহারীর উপরেই নির্ভর করেন। তিনি নিজে সাতপাঁচ থাকেন না। বনবিহারী তার অপ্রতিহত ক্ষমতা খাটাবার সুযোগ পায় এই পরিবারে। ভুলেই যায় যে সে সামান্য একজন চাকর, চাপরাশী মাত্র।

কৈলির চোখে ভাল লাগে রাঙাবাবুকে। ঠাকুরের মতন সুন্দর চেহারা, মিষ্টি সরল হাসি। সে লুকিয়ে লুকিয়ে মাঝে-মাঝে দেখে কিন্তু ধরা দেয় না। এমন সুন্দর লোক সে আর কখনও দেখেনি। সলিলকে দেখে শহরের লোকদের সম্বন্ধে তার ভুল ধারণাটা ধীরে-ধীরে বদলে যায়। সে ভাবে যেখানে রাঙাবাবুর মত মানুষ আছে সেখানকার লোক মন্দ হতে পারে না, কিছুতেই না।

কৈলি লালকুঠির পাশ দিয়ে জল আনতে যায়। বনবিহারী তাকে দেখেও যেন দেখে না। আগের মত কাছে ডাকে না। অপরাধটা কৈলি বুঝতে পারে না। সে মনে মনে স্থির করে, বুড়োর শত প্রয়োজনেও সে আর সাড়া দেবে না, ফরমাশ খাটবে না। অভিমানে সে ফুলতে থাকে। গুমরে মরে নিজের অন্তরে।

সলিল যে সতৃষ্ণ নয়নে দেখে কৈলিকে বনবিহারী তা দূর থেকে লক্ষ্য করে। সে মনে মনে স্থির করে ফেলে তার কর্তব্য। কৈলিকে সে সলিলের কাছে ভিড়তে দেবে না। কিছুতেই না। বনবিহারীর মনটা হঠাৎ যেন বিগড়ে যায় কৈলির উপর। কৈলি থেকে রাগটা ছিটকে গিয়ে পড়ে মেয়ে-জাতটার উপর। তার ধারণা মেয়েরা বেলে মাছের মত। বেলে বঁড়শীর টোপ খেলেও টের পাওয়া যায় না। কারণ, টোপ খেয়ে তারা চুপ করে পড়ে থাকে, কিন্তু ছিপ ওঠালেই দেখা যায় বঁড়শীতে লেগে আছে। মেয়েগুলো কোথায় কার কাছে মন সঁপে দেয়, তা সহজে বোঝবার যো থাকে না। শুধু পরিস্থিতির রকমফের হলেই তা প্রকাশ পায়।

ঝিলের ধারে ছাগলছানাটাকে ছেড়ে দিয়ে কৈলি গিয়ে বসে

শাল গাছটার নীচে। গাছের গোড়ায় ঠেসান দিয়ে বসে সে ভাবে নানা কথা। অন্যান্য কথার সঙ্গে লালকুঠির কথাও ঘুরে-ফিরে তার মনে আসে। মনে পড়ে তার রাঙাবাবুর কথা। রাঙাবাবু ফুল ভালবাসে।

কৈলি বনবিহারীর পূজার ফুল যোগাতো। সেই সঙ্গে সে দু-একটা ভাল ফুলও নিতো। রাঙাবাবু খুসী হতো ফুল দেখে। আজ ক-দিন সে ফুল যোগান দিচ্ছে না, বনবিহারীর উপর অভিমান করে। ফলে সলিলও ফুল পায় না। সে বেচারী হয়তো আশা করে বসে থাকে। কৈলির মনে হয় সে বনবিহারীর উপর অভিমান করে রাঙাবাবুর উপর অবিচার করছে। তাই পরদিন খুব ভোরে আঁচল ভর্তি করে ফুল নিয়ে সে রওনা হয় লালকুঠির দিকে। তখনও বনবিহারী ঘুম থেকে ওঠেনি। বাইরের খড়খড়ি দিয়ে উঁকি মেরে দেখে রাঙাবাবু অঘোরে ঘুমুচ্ছে। সে ভেবে পায় না ফুলগুলো কি করে রাঙাবাবুকে দেবে।

হঠাৎ তার খেয়াল হয়। সে ফুলগুলো খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে ছুড়ে ফেলে দেয়। ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়ে ফুলগুলো সলিলের তক্তাপোশের উপর।

কৈলির হাতের টিপ ব্যর্থ হয় না। সে খুসী মনে ফিরে যায় বাড়ী। কিন্তু ফুল ছুড়ে দেওয়ার গুরুত্বের কথা একবারও তার মনে আসে না।

ঘুম থেকে উঠেই সলিল তার বিছানার উপর ফুল ছড়ানো দেখে আশ্চর্য হয়। সে ভেবেই পায় না কোত্থেকে এত ফুল এলো। কে দিলে? হঠাৎ তার মনে হয় এ নিশ্চয়ই কৈলির কাজ। মনে তার সঙ্কোচ ও একটা চাপা আনন্দের ঢেউ খেলে যায়। বনবিহারী দেখলে নিশ্চয়ই অনর্থ করবে। সে তাড়াতাড়ি ফুলগুলোকে জড়ো করে ক্ষিপ্র হস্তে তুলে কাগজের মোড়কের মধ্যে রাখে।

তারপর মোড়কটাকে লুকিয়ে রাখে তক্তাপোশের নীচে।

বনবিহারী যথারীতি ঠাকুরের নাম করতে করতে এগিয়ে আসে সলিলের ঘরের দিকে। সলিলকে জাগানো ও মশারী তোলা তার নিত্য কর্ম।

হঠাৎ জানালার দিকে দৃষ্টি পড়তেই সে আঁতকে ওঠে। সলিলকে অনুযোগের স্বরে বলে, সর্বনাশ, খড়খড়ি খুলে ঘুমিয়েছ কেন ছোটবাবু, ঠাণ্ডা লগে যেতে পারে। তাছাড়া আঁকশি দিয়ে চোর জামা কাপড় নিয়ে যেতে পারে। বলাবাহুল্য সলিল ততক্ষণ গাঢ় কপট নিদ্রায় মগ্ন।

বনবিহারী আপন মনেই বকে যায়। কোনদিকে যদি এতটুকু খেয়াল থাকে!

সলিল ঘুম থেকে উঠতেই বনবিহারী সেই পুরনো প্রশ্নটা তোলে, আর ক-দিন এই জঙ্গলে পচতে হবে শুনি?

সলিল হেসে জবাব দেয়, তোমার সংসার নেই, ঘর নেই, অত তাড়া কিসের?

তোমাদের সংসারে ঢুকে আমার সংসার করা হলো না। খালি কাজ আর কাজ।

সলিল বিষয়টাকে হাল্কা করতে চেষ্টা করে। জানো বিহারীদা কর্মই জীবন, কর্মই উপাসনা।

বনবিহারী ধমকের সুরে বলে, রাখো তোমার কেতাবী কথা। কেতাবের কথা কেতাবেই মানায়। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সে আবার বলতে শুরু করে।

নিজে যদি তা মানতে তাহলে আর অপকর্মে সময় কাটাতে না।

অপকর্মটা কি করছি শুনি?

ঘুমুচ্ছো, বেড়াচ্ছো, আর একগুষ্টি সাঁওতাল ছেলেমেয়ে নিয়ে



হৈ-হুল্লোড় করছো। আমার বাপু এসব ভালো লাগে না।

আচ্ছা, বিহারীদা, তুমি সংসার করলে না কেন? সলিল কথার মোড়টা ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে।

বলেছি তো, তোমাদের সংসারে এসে আমার আর সংসার করা হলো না।

এ তোমার অভিমানের কথা।

বনবিহারী একদৃষ্টে অদূরে জঙ্গলটার দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তার মনে পড়ে, আজ থেকে প্রায় ত্রিশ বছর আগের কথা। তখন সে বাইশ বছরের যুবক। সলিলের বাবা ডাঃ সুবিনয় রায়ের খাস চাপরাশী সে। কালিম্পঙ হাসপাতালের সবাই তাকে খাতির করে। ডাঃ সাহেবের খাস বেয়ারা সে। তার অবাধ গতি হাসপাতালের সর্বত্র।

একদিন ফর্সা ধবধবে চেহারার পনর-ষোল বছরের কাঞ্চী আসে ডাঃ রায়কে দেখাতে। সঙ্গে তার বৃদ্ধা মা। কাঞ্চীর রূপ যৌবন যেন উপচে পড়ে। চোখ দুটো যেন কথা কয়, হাসে। বনবিহারীর ভাল লাগে কাঞ্চীকে। সে ঝুঁকে পড়ে সে দিকে। যখন-তখন এগিয়ে যায় তাকে সাহায্য করতে। সে নিজে নিয়ে যায় তাকে ডাঃ রায়ের কাছে। পরীক্ষা করিয়ে, ওষুধের ব্যবস্থা-পত্র এনে দেয় তার হাতে। হাসপাতালের কম্পাউণ্ডারকে ধরে ওষুধের যোগাড় করে দেয়। খুসী হয় কাঞ্চী ও তার মা। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তারা। তারপর বনবিহারী সুযোগ পেলেই কাঞ্চীর বাড়ী যাতায়াত করে।

কাঞ্চীর মনটাও ঘোরে বনবিহারীর প্রতি। চটপটে সুশ্রী বনবিহারীকে ভালো লাগে তার চোখে। সে ধীরে-ধীরে ধরা

দেয় বনবিহারীর কাছে। বনবিহারীও প্রশ্রয় দেয় তার দুর্বলতাকে। শেষপর্যন্ত সে পারে না নিজেকে সামলাতে। কিছুদিন পর মাতৃত্বের লক্ষণ দেখা দেয় কাঞ্চীর দেহে। কাঞ্চী সজল চক্ষে আশ্রয় ভিক্ষা করে, বিয়ের দাবি জানায়। বনবিহারী আশা দেয়, সান্ত্বনা দেয় তাকে। কিন্তু কথা রক্ষা করতে পারে না। মার অসুখের অজুহাতে সে একমাসের ছুটি নিয়ে চলে যায় দেশে। দায়িত্ব এড়িয়ে গিয়ে সে স্বস্তি বোধ করে। মনে মনে নিজের বুদ্ধির তারিফ করে। তাকে আর ফিরতে হয় না কালিম্পঙে। কারণ ইতিমধ্যে ডাঃ রায় বদলী হয়ে যান বহরমপুরে। কাজেই ছুটির শেষে বনবিহারী বহরমপুরে এসে কাজে যোগদান করে।

একদিন কালু চাপরাশী আড়ালে ডেকে তাকে কাঞ্চীর আত্ম-হত্যার সংবাদটা দেয়। বনবিহারী হঠাৎ কেঁপে ওঠে। তীব্র বিবেকের দংশন সে অনুভব করে, প্রতিজ্ঞা করে মনে মনে, অকৃতদার থেকে সে তার কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে। কালুকে অনুরোধ জানায় সে যেন কাঞ্চী ও তার সম্পর্কের কথাটা কারো কাছে প্রকাশ না করে। কিন্তু ঘটনাটা ডাঃ রায়ের কাছে গোপন ছিল না। তিনি বনবিহারীকে দেখেই অগ্নিশর্মা হন, বলেন, তোকে গুলি করে মেরে ফেলবো কুকুর জানোয়ার কোথাকার। তারপর রাগ কমলে তিনি পাপের গুরুত্বটা বুঝিয়ে দেন।

এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই বিহারী, ভগবান তোকে কখনও ক্ষমা করবেন না। কাপুরুষের মত পালিয়ে না গিয়ে কাঞ্চীকে তোর বিয়ে করা উচিত ছিল।

বনবিহারী তার ভুলটা বুঝতে পারে। মনিব যদি তাকে গুলি করে মেরে ফেলতেন সে খুসীই হতো। এতটুকু প্রতিবাদ সে

করতো না। পাপের মাশুল দিতে সে কুণ্ঠা বোধ করতো না।

কাঞ্চীর ছায়া মূর্তিটা জগদ্দল পাথরের মত আজও যেন তার বুকের উপর চেপে আছে।

সলিল অবাক হয়ে লক্ষ্য করে বনবিহারীর ভাবান্তরটা।

সেদিন বিকেলে সলিল বেরিয়ে পড়ে আঁকাবাঁকা মেটে রঙের সুরকির পথ ধরে। সে মাইলটাক পথ হেঁটে একটু জিরিয়ে নেয়। সন্ধ্যার অন্ধকারে ফিরতি পথে সে গুলিয়ে ফেলে লালকুঠির সোজা রাস্তাটা। হঠাৎ তার চোখে পড়ে কৈলিকে। সে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। কৈলিরও চোখে পড়ে সলিলকে। দু-জনের মধ্যে দূরত্বটা কমে আসতেই সলিল ডাকে, কৈলি।

কৈলি ভাবতেও পারেনি রাঙাবাবু তাকে ডাকবে। লজ্জা যেন তার দ্বিগুণ বেড়ে যায়। মাথা নীচু করে সে দ্রুত হাঁটতে থাকে। সলিল প্রাণপণ চেষ্টা করে কৈলিকে অনুসরণ করতে। কোটের বোতামটা এঁটে দেয় হাওয়া থেকে দেহটাকে রক্ষা করার জন্য। ততক্ষণে কৈলি এগিয়ে যায় অনেকখানি। অচেনা আঁকাবাঁকা পথে চলতে গিয়ে সলিল হোঁচট খায়। কৈলি মাঝে মাঝে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে আর হেসে ভেঙ্গে পড়ে।

কৈলিকে অনুসরণ করে পথ চলতে চেষ্টা করে সলিল। মাঝে-মাঝে তার চোখে পড়ে কৈলির সুপুষ্ট দেহটা। ছোট্ট শাড়ীটা তার দেহটাকে যেন সম্পূর্ণ ধরে রাখতে পারে না। চলার সঙ্গে তার আঁটসাঁট শাড়ীটা দেহের খাঁজ থেকে ধীরে-ধীরে সরে যায়।

সলিল ডাকে, দাঁড়াও কৈলি, আমিও যাবো তোমার সঙ্গে।

হেসে হাত নেড়ে কৈলি প্রত্যাখ্যান করে সলিলের প্রস্তাব।

সলিলের যেন জেদ চড়ে যায়। নির্জন পরিবেশে তার দুঃসাহস বেড়ে যায়। সে মরিয়া হয়ে ছোটে, কৈলিকে ধরার জন্যে। কৈলি সহজভাবে হেঁটে চলে। সে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নেয় দু-জনের মধ্যের দূরত্বটা। সলিল তার গতির বেগ বাড়িয়ে দেয়, সঙ্গে সঙ্গে কৈলিও।

সলিলের চোখে পড়ে কৈলির উদ্ধত যৌবন। শাড়ীটাব একপ্রান্ত যেন কোন রকমে আটকে রয়েছে শীর্ষদেশে। একটু জোরে হাওয়া লাগলে হয়ত বৃন্তচ্যুত হয়ে পড়বে। একটা শিহরণ খেলে যায় তার দেহে, সঙ্গে সঙ্গে একটা নেশা যেন তাকে পেয়ে বসে।

আবার পেছনে তাকাতে গিয়েই হঠাৎ কৈলি গাছের শেকড়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়। এই সুযোগে তাকে দৌড়ে এসে ধরে ফেলে সলিল। হাত ধরে ওঠাতেই সে দেখে কৈলিব হাঁটুর খানিকটা জায়গা ছড়ে গিয়েছে। মোটা শাড়ীর উপর ভেসে উঠেছে তাজা রক্তের ছাপ। কিন্তু তার ভ্রূক্ষেপ নেই। একপাশে সরে গিয়ে কৈলি কিছু দূর্বাঘাস তুলে নেয়। একটা গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁতে চিবিয়ে দূর্বারস বার করে লাগায় সেই ক্ষতস্থানে। সলিল হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় ক্ষণিকের জন্য। তার দৃষ্টি পড়ে কৈলির সুপুষ্ট উরু ও হাঁটুর অনাবৃত অংশটার দিকে। সে দৃষ্টিটা ফিরিয়ে নিতে চেষ্টা করে কিন্তু পারে না। এগিয়ে গিয়ে কৈলির হাত ধরে অনুরোধ জানায় তার সঙ্গে লালকুঠিতে যেতে। সেখানে ওষুধ আছে।

সলিলের কথায় কান দেয় না কৈলি। সলিলকে জোর করে সরিয়ে দিয়ে সে পথটা পরিষ্কার করে নেয়। নিমেষের মধ্যে পথের বাঁকে সে অদৃশ্য হয়ে যায়।

কৈলি ছুটে পালিয়ে যেতেই সলিলের যেন সম্বিৎ ফিরে আসে।

সে তার আচরণের জন্য লজ্জিত হয়। নির্জন পরিবেশ তাকে বেপরোয়া করে তুলেছিলো। তার শিক্ষা-কৃষ্টি-সংস্কার সব যেন ঝোপ জঙ্গলের মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য হারিয়ে গিয়েছিল।

হোঁচট খেতে খেতে প্রায় মাতালের মত টলতে টলতে সলিল লালকুঠিতে ফেরে। অবসাদে ক্লান্তিতে তার চোখ দুটো বুজে আসে, মাথার মধ্যে সে যন্ত্রণা অনুভব করে।

দুরন্ত পাহাড়ী হাওয়াটার প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। পরদিন সলিলের জ্বর আসে।

বনবিহারীর মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। সে একা কি করবে? সে জানে সলিলের ধাত। অসুখ-বিসুখ হয় না বটে, কিন্তু হলে তার মাত্রা ঠিক থাকে না। তার মাথায় অনবরত জল ঢালতে হয়, বরফ দিতে হয়, তবে জ্বর নামে।

বনবিহারী রান্নাবান্না ছেড়ে সলিলকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। মাথায় অনবরত জল ঢেলে জ্বরটা নামায় বটে। কিন্তু বুকে ঠাণ্ডা লেগে তার অন্য উপসর্গ দেখা দেয়। ব্যস্ত হয়ে পড়ে বনবিহারী। সে সলিলের অনুমতি চায়, কলকাতায় একটা তার পাঠাই?

সলিল ইঙ্গিতে বারণ করে। বারণ করার কারণটা বনবিহারী জানে। ডাঃ রায় রক্তের চাপে ভুগছেন।

সলিলের নির্দেশে বনবিহারী ওষুধের ব্যাগটা খুলে ওষুধ দেয়। হঠাৎ তার মনে পড়ে ইলার কথা। কোলকাতা থেকে রওনা হবার সময় ইলা তাকে বলেছিল, প্রয়োজন হলে আমাকে খবর দিতে দ্বিধা বোধ করো না বিহারীদা।

বনবিহারী নিজের ঘরে এসে অনেক ভেবে-চিন্তে ইলাকে সংক্ষেপে একখানা চিঠি লিখে। সলিলের অসুখের কথাটা সে গোপন রাখে না। আরো জানায়, এ তল্লাটে কোন ডাক্তার

নেই। সর্বশেষে অনুরোধ জানায় সে, বড়বাবুকে যেন জানানো না হয় ছোটবাবুর অসুস্থতার কথা।

সেদিন সন্ধ্যার ঘটনার পর কৈলির লজ্জার মাত্রা আরও বেড়ে যায়। বিশ্বের জড়তা যেন তাকে ঘিরে ধরে। সহজ ভাবটা হারিয়ে ফেলে সে। মনটা তার চায় একবার রাঙাবাবুকে দেখতে, তার খবর নিতে।

অগত্যা পাতকুয়ো থেকে জল আনবার সময় ইচ্ছে করেই সে লালকুঠির রাস্তা ধরে ঘুর পথে যায়। সলিলের শোয়ার ঘরের জানালার ফাঁক দিয়ে সে তাকায়। দেখে, বনবিহারী সলিলের মাথার কাছে বসে পাখাব হাওয়া দিচ্ছে। নির্জীবের মত পড়ে রয়েছে রাঙাবাবু। আশঙ্কায় দুরুদুরু করে ওঠে তার বুকের ভেতরটা। হঠাৎ রাঙাবাবুর কেন অসুখ হলো সে ভেবে পায় না। কলসীটা বাইরে রেখে সে বাড়ীর ভিতর গিয়ে ঘরের চৌকাঠের কাছে দাঁড়ায়। বাইরে একটা আবছা ছায়ার মত বনবিহারীর চোখে পড়তেই সে জিজ্ঞেস করে, ওখানে কে দাঁড়িয়ে?

কোন উত্তর আসে না।

অগত্যা বনবিহারী উঠে এসে দেখে কৈলি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

বনবিহাবী কৈলিকে জানায়, রাঙাবাবুর অসুখ করেছে। সঙ্গে সঙ্গে অনুরোধ করে সে, এক কলসী জল এনে দিতে পারবি? মাথাটা ধুইয়ে দেবো।

কৈলি এক দৌড়ে গিয়ে পাতকুয়ো থেকে জল নিয়ে আসে।

বনবিহারী কলসীর জলটা বালতির মধ্যে ঢেলে ঘরের ভিতরে

নিয়ে আসে। পরে কৈলিকে ডাকে, আয় ভেতরে আয়।

কৈলি চৌকাঠ থেকে এক পাও এগোয় না।

বনবিহারী আবার ডাকে তাকে।

কৈলি তবুও নড়ে না, সাড়া দেয় না।

বনবিহারী ভেবেছিল কৈলির সাহায্যে সে ছোটবাবুর মাথাটা ধুইয়ে দেবে।

কৈলি অসুখকে বড় ভয় করে। তাই যথাসাধ্য এড়িয়ে চলাতে চেষ্টা করে। তার সংস্কার, রোগীর উপর নাকি জিন্ বা শয়তান ভর করে। কখন কখন নাকি শুশ্রূষাকারীর উপরও ভর করে। তার বন্ধু লছমীর কাছ থেকে শুনেছে সে এসব কথা। লছমী শুনেছে নাকি এক বৃদ্ধ মাঝির কাছ থেকে, সে অনেক রকম তুকতাক জানে। তাই কৈলি বনবিহারীর বারবার ডাকা সত্ত্বেও নড়েনি। সাহস পায়নি রোগীর কাছে যেতে।

বনবিহারী একাই সলিলের মাথাটা ধুইয়ে দেবার বন্দোবস্ত করে। চটের ফালির এক প্রান্ত সে বালিশের নীচে গুঁজে দিয়ে আর এক প্রান্ত লম্বা করে ঝুলিয়ে দেয় একটা খালি বালতির মধ্যে। তারপর মগ দিয়ে জল ঢালে ধীরে-ধীরে। মাথা ধোয়া শেষ হলে তোয়ালে দিয়ে সে সলিলের মাথাটা মুছে দেয়।

কৈলি চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখে।

মাথা ধোয়ার জলটা বাইরে ফেলতে গিয়ে বনবিহারী দেখে কৈলি সেই একঠায় দাঁড়িয়ে আছে। সে তাকে বিদ্রূপ করে, জানি তোদের যত সাহস শিকারের বেলায়, মানুষ খুনের বেলায়। সৎকাজে, ভালকাজে তোদের শক্তি সাহস কাজে লাগে না।

কৈলি কোন জবাব দেয় না। অপরাধীর মত সে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

বনবিহারীও জানে এরা রোগকে ভয় করে। তাই কাছে এগোয় না। জেনেশুনেও সে রাগটা ঝাড়ে কৈলির উপর।

জংলী কোথাকার! ভাগ এখান থেকে।

তার চিৎকারে সলিলের তন্দ্রাভাবটা কেটে যায়। সে ক্ষীণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, কি হলো বিহারীদা?

কিচ্ছু হয়নি, একটা কুকুর এসেছিল, ভাগিয়ে দিয়েছি।

হঠাৎ বনবিহারী ইলার কথা পাড়ে।

আচ্ছা ছোটবাবু তোমার ইলাদির কথা মনে পড়ে?

পড়ে বৈকি! রোগ শয্যায় মা-বাপ, বন্ধু-বান্ধবী, আপনার জন, সবাইকেই মনে পড়ে বিহারীদা।

যদি সে হঠাৎ এসে পড়ে তবে কেমন হয়?

ক্ষেপেছো নাকি! কোন খোঁজ-খবর নেই, অমনি সে এসে পড়বে। তাছাড়া তার এগজামিনের পড়া আছে।

আমার কিন্তু মনে হয় সে আসতেও পারে। আমার মনের কথা অনেক সময় ফলে কিন্তু। জোর দিয়ে বলে বনবিহারী কথাটা।

সলিলের রুগ্ন শুষ্ক মুখে হাসি দেখা দেয়।

সে মন্তব্য করে, তুমি একটা আস্ত পাগল।

বনবিহারী সলিলের মনটাকে ইচ্ছে করেই কৈলির বিরুদ্ধে বিষিয়ে দেবার চেষ্টা করে।

দেখলে তো জংলীদের কাণ্ডটা। তোমার অসুখের খবর পেয়েও কেউ এলো না। এমন কি কৈলিও। যে আগে দু-বেলা আসতো, ভাজা, বড়াটা নিতো, খুসী মনে ফরমাশ খাটতো। আজ এই দুর্দিনে তার টিকিটি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। বেইমান,

মহা বেইমান।

সলিল জানে কৈলির না আসার জন্য সে নিজেই দায়ী। সে বলে, হয়ত আমাদের রূঢ় ব্যবহারে সে অসন্তুষ্ট হয়েছে। তাই আসে না, খবর নেয় না।

বনবিহারী কথাটা অস্বীকার করতে পারে না। ইদানীং সে সত্যিই তার প্রতি রূঢ় ব্যবহার করছে। কুকুর বেড়ালের মত খেদিয়ে দিয়েছে।

এদিকে রাঙাবাবুর অসুখ সারছে না দেখে কৈলির মনটা ব্যাকুল হয়ে ওঠে। সে একবার ভাবে, সুখন মাঝির কাছ থেকে ওষুধ আনবার জন্যে বলবে বুড়োকে। পরক্ষণেই সে স্থির করে বুড়োকে কিছু বলবে না। হয়ত আবার সে মুখ খিঁচিয়ে উঠবে। সে নিজের নাম করে নিয়ে আসবে ওষুধটা।

একটা ছোট্ট ভাঁড় হাতে করে নিয়ে সে রওনা হয় সুখন মাঝির বাড়ী। এ তল্লাটে তার মত হাতযশ আর কারো নেই। তা-ছাড়া সে নাকি নানারকম তুকতাক-ঝাড়ফোঁক জানে। জিন্ বা শয়তান কারো উপর ভর করলে নিমেষের মধ্যে সে সারিয়ে দিতে পারে। তাই কৈলির অখণ্ড বিশ্বাস সুখন মাঝির উপর। তার ওষুধে নিশ্চয়ই কাজ হবে। রাঙাবাবু সেরে উঠবে।

সুখন তখন লতাপাতা ছেঁচে রস তৈরী করছিল। নানা গাছ-পালার ও শেকড়ের রস দিয়ে সে ওষুধ তৈরী করে। একটু ইতস্তত করে কৈলি জানায়, মাঝি হামার ভুখার আইছে, মাথা ঘুমছে।

সুখন আশ্বাস দেয়, হাম দাওয়া দিছে, তুর বীমার না থাকবে।

সে উঠে গিয়ে বাঁশের চোঙটা নিয়ে আসে। খানিকটা পাতার রস ঢেলে দেয় কৈলির হাতের মাটির ভাঁড়টার মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে সে ওষুধ খাবার নিয়মটাও বলে দেয়।

খুসী হয়ে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলে আসে কৈলি সোজা লালকুঠিতে। সেখানে পৌঁছেই দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারে সে। দেখে রাঙাবাবু শুয়ে আছে, কাছে বনবিহারী নেই। সে সাহস সঞ্চয় করে সোজা এসে দাঁড়ায় সলিলের শিওরের কাছে। তার চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে।

পায়ের শব্দ কানে আসতেই সলিল চোখ মেলে তাকায়। কৈলিকে দেখে সে অবাক হয়ে যায়।

ভালো আছ কৈলি ?

কৈলি মাথা নেড়ে জানায় যে সে ভাল আছে। তারপর শাড়ীর আঁচলের তলায় সযত্নে রক্ষিত মাটির ভাঁড়টি বার করে সে সলিলকে দেয়।

সলিল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায় কৈলির মুখের দিকে।

সুখন মাঝি দাওয়াই দিছে। ইটা পিলে বুখার বিলকুল আচ্ছা হবে।

সলিলের মুখে একটা তৃপ্তির হাসি ফুটে ওঠে। খানিকক্ষণ ইতস্তত করে সে কৈলিকে জানায়, মুখ ধুয়ে নিয়ে সে ওষুধটা পরে খাবে।

খুসীতে কৈলির চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তার দৃঢ় বিশ্বাস, এ ওষুধে নিশ্চয়ই রাঙাবাবু সেরে উঠবে। সে আরও বলে, সুখন মাঝির ওষুধ মরা মানুষকে বাঁচায়।

বনবিহারী তখনও পাতকুয়ো থেকে জল নিয়ে ফেরেনি। সে দেখলে হয়ত আবার খেদিয়ে দেবে। তাই কৈলি ত্রস্তে বেরিয়ে যায়।

কৈলি চলে যেতেই হাত বাড়িয়ে সলিল ওষুধটা তক্তাপোশের নীচে রেখে দেয়। সে ভাবে সাঁওতালদের মন কত সরল। কৈলি

সরল বিশ্বাসে শাড়ীর আঁচলে লুকিয়ে ওষুধ এনেছে তার জন্য। কি অসুখ, কার অসুখ বলে এনেছে কে জানে। সে মনে মনে খুসী হয়, স্থির করে, কৈলির সরল বিশ্বাসের মর্যাদা দেবে। ওষুধটা সে খাবে।

বিকেলের দিকটা সলিল অনেকটা সুস্থ বোধ করে, জ্বরটাও কমে আসে। সে উঠে বসতে চায়। কিন্তু বনবিহারী তাকে বারণ করে। বেশী নড়াচড়া করলে আবার জ্বর বাড়বে।

মাঝে-মাঝে কৈলি লুকিয়ে দেখে যায়। সলিলকে উঠে বসতে দেখে সে ভাবে সুখন মাঝির ওষুধে নিশ্চয়ই কাজ করেছে। একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে সে।

আজ বনবিহারীর মনটা অনেকটা হাল্কা। সে হাট থেকে একজোড়া মুরগী আনে। উদ্দেশ্য মুরগীর মাংস রাঁধবে আর লুচি ভাজবে। কৈলিকে দেখেই সে ডাকে। আজ তার কণ্ঠস্বরে আদৌ ঝাঁজ নেই। কৈলি ভুলে যায় তার অভিমান। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে রান্না ঘরের দিকে। বনবিহারী কৌটা থেকে বার করে নেয় রকমারী মশলা। তারপর সেগুলো কৈলির দিকে এগিয়ে দেয়।

কৈলি সোৎসাহে কাজে লেগে যায়। খুব মিহি করে পিষে দেয় মশলাগুলো। তারপর সে বনবিহারীব দিকে হাত বাড়ায়।

বুড়া, হামার বখশিশ।

সন্ধ্যার পর আসিস, মাংস লুচি দেবো।

দুপুরের রান্নাটা তাড়াতাড়ি সেরে নিয়ে বনবিহারী সলিলের কাছে গিয়ে বসে।

সলিল বলে, বিহারীদা, বিকেল হলেই আমার কেমন ভয় হয়, কেমন যেন শরীরটা খারাপ হতে আরম্ভ করে। কিন্তু আজ অতটা ভয় হচ্ছে না। বেশ ভালই লাগছে।

বনবিহারী হেসে বলে, আজ তো ভাল লাগবেই। ভাল লাগার দিন।

মানে ? ভ্রূ কুঁচকে প্রশ্ন করে সলিল।

সঙ্গে সঙ্গে বনবিহারী কথাটা ঘুরিয়ে নেয়, মানে মুরগী রান্না করছি দেখেছো কিনা, তাই শরীরটা ভাল লাগছে। নোলা বটে।

বনবিহারী জলচৌকিটা আরও কাছে টেনে নিয়ে বসে। আচ্ছা আজ যদি এখানে ইলাদি থাকত, কত যত্ন হতো বলো তো। আমি মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ।

তোমার চেয়ে বেশী কি সে পারত ?

কি যে বলো, সে হলো ডাক্তার, আর আমি আকাট মুখ্যু।

বনবিহারীর দৃঢ় বিশ্বাস, সলিলের অসুখের সংবাদ পেয়ে ইলা নিশ্চয়ই আসবে। মনে মনে হিসাব করে দেখে সে। ঠিক সময়ে তার চিঠি পেয়ে রওনা হলে আজই ইলাদি এখানে পৌঁছুবে। সেই হিসেবেই সে মুরগীর মাংস ও লুচির ব্যবস্থা করেছে। সলিলের পাশের ঘরখানা ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে রেখেছে ইলার জন্য। লুচি ও মুরগীর মাংস ইলা খুব ভালবাসে একথা জঙ্গলে এসেও বনবিহারী ভুলে যায়নি।

হঠাৎ বাইরে কার গলার শব্দ শোনা যায়। বনবিহারী দরজা খুলে বাইরে ছুটে আসে। দুটো সাঁওতাল কুলির দু-হাত ভর্তি

নানা জিনিস। পিঠে বিছানা-পত্র। কে এসেছে তার বুঝতে বাকি থাকে না। তবু সে কুলিকে প্রশ্ন করে, কে আসছে?

মাইজী আইছে। সঙ্গে সঙ্গে কুলি অঙ্গুলি-সংকেতে দেখিয়ে দেয় পেছনের দিকে।

আনন্দে বনবিহারী ঘরে ছুটে আসে। সলিলকে বলে, কি আমি বলেছি না, আমার মন যা বলে তা সত্যি হয়। ইলাদি এসেছে।

সত্যি? হঠাৎ আনন্দের উত্তেজনায় সলিল উঠে বসবার চেষ্টা করে

বনবিহারী বারণ করে তাকে। ধরে শুইয়ে দেয়।

মাথার উপব রঙীন লেডিজ ছাতা, চোখে কালো গগলস্ ও পায়ে সুদৃশ্য জুতা পরে একজন সুন্দরী মহিলাকে আসতে দেখে সাঁওতাল ছেলেমেয়ের দল বখশিশের আশায় তাকে ঘিরে ধরে। বাধ্য হয়েই খানিকটা দূরে ইলাকে রিক্সা ছেড়ে দিয়ে পায়ে হেঁটে আসতে হয়। ভিড় ঠেলে রিক্সা এগুতে পারছিল না।

ইলা আসার সঙ্গে সঙ্গে বনবিহারী তার হাত থেকে প্লাষ্টিকের বালতিটা নিয়ে বারান্দায় রাখে। তারপর সাঁওতাল ছেলেমেয়েদের সে ধমক দেয়। তার ধমক খেয়ে শিশুর দল যে যে-দিকে পারে ছুটে পালায়।

ইলা বনবিহারীকে জিজ্ঞেস করে, বাবু এখন কেমন আছে?

ভাল।

বনবিহারী ইলাকে চাপা কণ্ঠে অনুরোধ জানায়, তার চিঠির কথাটা সলিলের কাছে যেন গোপন থাকে।

ইলা মাথা নেড়ে জানায়, তাই হবে।

ইলা হাত-মুখ ধুয়ে সলিলের শিওরের কাছে এসে বসে। সলিল ঘুমের ভাণ করে পড়ে থাকে। তার ডান হাতের কব্জিটা ইলা নিজের হাতে তুলে নেয়। নাড়ীর গতি পরীক্ষা করে সে একটি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। জ্বর নেই, তবে দুর্বলতা আছে।

ইলার হাতের স্পর্শে হঠাৎ যেন সলিলের ঘুম ভেঙ্গে যায়, এমনি ভাণ সে করে।

এখন কেমন আছো ?

ভাল, ক্ষীণ কণ্ঠে জবাব দেয় সলিল।

ভাল না ছাই।

হঠাৎ এলে যে ?

তোমার হটকারিতার জন্যেই হঠাৎ আসতে হলো।

যথা—

এই জঙ্গলে আসা এবং অসুস্থ হয়ে পড়া।

অসুস্থতার কথা জানলে কি করে ?

ইলার মনে পড়ে বনবিহারীর নিষেধের কথা। তাই সে নিজের বুকের মধ্যস্থলে আঙ্গুলের ডগা ছুঁইয়ে বলে, খবর দিয়েছেন ইনি।

ইনি দেখছি সদাই জাগ্রত।

শুধু জাগ্রত নয়, অন্যের কারণে বিব্রতও বটে।

দুজনেই একসঙ্গে হেসে ওঠে।

সন্ধ্যার সময় জ্বর আসে সলিলের। বনবিহারী মোটা কম্বলের উপর লেপ চাপা দেয়, হাঁপিয়ে ওঠে সলিল। ইলাকে উদ্দেশ্য করে সে চেঁচিয়ে বলে, বিহারীদা আমাকে মেরে ফেললে।

ইলা হাসতে হাসতে সলিলের কাছে এসে দাঁড়ায়। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায় সে তার দিকে।

হাফ-বয়েল হয়ে গেছি, কম্বলের উপর লেপ।

শিশুর মত নালিশ জানায় সলিল।

লেপখানা শরীরের উপর থেকে সরিয়ে দেয় ইলা।

এখন ঠিক আছে তো ?

ইলার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে সলিল। চোখে ফুটে ওঠে একটা মিনতির দৃষ্টি। অর্থটা বুঝে নেয় ইলা, সলিল চায় সে তার কাছে বসে গল্প করুক।

মাকে এখনও সংবাদ দেওয়া হয়নি। চিঠিটা লিখে আসছি এক্ষুণি।

নিজের ঘরে ফিরে যাবার সময় শাসনের ভঙ্গিতে ইলা তাকায় সলিলের দিকে।

সলিল বুঝতে পারে ইঙ্গিতটা, ছেলেমানুষের মত অত চেঁচামেচি করা ঠিক নয়, নিতান্ত দৃষ্টি-কটু।

বনবিহারীর দৃঢ় বিশ্বাস, ইলার ব্যবস্থায় ও চিকিৎসায় সলিল নিশ্চয়ই সেরে উঠবে তাড়াতাড়ি। কিন্তু দেখা গেল ইলার সেবা শুশ্রূষার সুযোগ পেয়ে সলিলের জ্বর যেন পাল্লা দিয়ে চলছে। ইলা জানে পাহাড়ী জ্বরের ধরণই এইরকম। বাড়তি-কমতির ঠিক নেই।

এতদিন বনবিহারী পাহাড়ী হাওয়ার ভয়ে জানালা দুটো প্রায় বন্ধ করে রেখেছিল। এখন ইলার নির্দেশে সে খুলে দেয়। ঘরটাকে ঝাঁটা দিয়ে ভাল করে পরিস্কার করতে গিয়ে হঠাৎ ঝাঁটার ডগায় ঠেকে কৈলির দেওয়া ওষুধের মাটির ভাঁড়টা। হাতে নিয়ে দেখে সবুজ মত কি যেন শুকিয়ে রয়েছে, ভেবে পায় না কোথেকে এটা এলো। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সে তাকায় সলিলের দিকে।

সলিল ভুলেই গিয়েছিল, কৈলির দেওয়া ওষুধের অস্তিত্ব। হঠাৎ ভাঁড়টা বনবিহারী তুলে ধরতেই তার মনে পড়ে কৈলির কথা। কৈলি সরল বিশ্বাসে ওষুধটা দিয়েছিল, কিন্তু খাওয়া হয়নি। উপরন্তু অনাদরে অবহেলায় একটি সরল মেয়ের আন্তরিকতার নিদর্শনটুকু শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেলো। সলিল অন্তরে অনুশোচনায় ভেঙ্গে পড়ে। কৈলি যদি জানতে পারে তার দেওয়া ওষুধটুকু এমনভাবে অবহেলা করা হয়েছে তাহলে সে খুবই মর্মাহত হবে।

বনবিহারী নির্মমভাবে জানালা দিয়ে ভাঁড়টাকে ছুড়ে ফেলে দেয়। ইচ্ছা সত্ত্বেও সলিল বাধা দিতে পারে না, প্রতিবাদ জানায় না। বুকের ভেতরটা ব্যথায় যেন টন্‌টন্‌ করে ওঠে। সে পাশ ফিরে শোয়।

সেদিন খেতে বসে ইলা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করে বনবিহারীকে। অসুখের আগে সলিল কিভাবে দিনগুলো কাটাতো। অভিযোগের সুরে বনবিহারী বলে যায়, সাঁওতাল শিশুদের সাথে হৈ-হুল্লোড় করে, আর আমার সাথে ঝগড়া করে।

ইলা মনে-মনে বলে, তা সে পারে, কারণ বয়সের তুলনায় নিতান্ত ছেলেমানুষই আছে।

বনবিহারী তার আর্জি পেশ করে।

দিদিমণি, তুমি তাকে কোলকাতায় নিয়ে যাও। আমি আর পারিনে এ জঙ্গলে থাকতে।

ও কি আমার কথা শুনবে ?

আমি জানি তোমার কথা ঠেলতে পারবে না। তোমাকে ছোটবাবু ভয় করে, মান্য করে।

হেসে ফেলে ইলা।

আমি বাঘ না ভাল্লুক, আমাকে সে ভয় করবে ?

কি একটু ভেবে নিয়ে ইলা আবার প্রশ্ন করে, তোমার সঙ্গে কি নিয়ে ঝগড়া করে ?

বনবিহারী এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পায় না। এতদিনের অভিযোগগুলো যেন কর্পূরের মত উবে যায়।

ইলা আসার এক সপ্তাহের মধ্যেই সলিল অনেকটা সেরে ওঠে। এখন সে উঠে বসে, একটু একটু চলা ফেরাও করে। কখনও কখনও বাইরের খোলা জায়গায় এসে বসে।

সেদিন বাইবে বেতের চেয়ারে মুখোমুখি বসে তুজনের মধ্যে কথা হচ্ছিল। ইলা জিজ্ঞেস করে, জায়গাটা কেমন লাগছে।

খুব ভালো।

কারণ ?

কারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, নির্জনতা, তাছাড়া শহরের স্বার্থ, দ্বেষের আওতার বাইরে বলে।

আমার কিন্তু এসব জায়গা ভাল লাগে না, জংলী পরিবেশ, কেমন যেন ভয়-ভয় করে। আমার কাছে ভাল লাগে শহর ও সমুদ্র। সমুদ্রের বিশালতা মনের প্রসারতা এনে দেয়, আর শহরের পরিবেশ সুরুচির পরিচয় দেয়।

ইলার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতটা সলিলের বুঝতে বাকী থাকে না। সে পাল্টা খোঁচা দেয়।

উপভোগ করবার মত মন ও চোখ তোমার নেই।

ইলা আরেকটা খোঁচা দেয়, ভাল-মন্দ বুঝবার মত বুদ্ধি চাই।

সলিল যেন ঘায়েল হয়ে পড়ে।

অদূরে সাঁওতাল ছেলেমেয়ের দল দাঁড়িয়ে, বখশিশের আশায়,

লজেন্সের আশায়। অবাক হয়ে দেখে তারা ইলাকে। তার ফর্‌সা ধবধবে চেহারাটা যেন ধাঁ-ধা লাগায় তাদের চোখে। হঠাৎ তাদের দিকে দৃষ্টি পড়তে সলিল বলে, এই শিশুগুলি অনেকদিন আমায় দেখেনি, লজেন্স, বিস্কুটও পায়নি।

লজেন্স ও চকোলেটের বাক্সটা খুলে সে এক মুঠো ছড়িয়ে দেয়। ছেলের দল কাড়াকাড়ি করে লজেন্স ও চকোলেটগুলো নিয়ে। দুজনে প্রাণভরে উপভোগ করে এদৃশ্য। শিশুর দল চলে যেতেই সলিল বলে, প্রথমে ওরা ওসব ছুঁতোনা। মনে করত, ওতে ওষুধ মেশানো আছে। বলেই সশব্দে হেসে ওঠে সে।

এখন ?

এখন আর ভয় করে না। বন্ধুর মত মেশে, বিশ্বাস করে, যখন তখন আসে, আব্দার করে।

অতটা আস্কারা দিও না। আমি জংলীদের বিশ্বাস করিনে। এরা যখন-তখন যা-তা করতে পারে। তাদের পশুত্ব এখনও ঘোচেনি। অসাধ্য বলতে ওদের কিছু নেই।

প্রতিবাদ জানায় সলিল। হঠাৎ সে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। ইলার জবাবের অপেক্ষা না করেই সে বলে যায়, শহরের খুন ডাকাতি ও ব্যাভিচারের ইতিহাস জানলে জংলীরাও লজ্জা পাবে। জংলী জানোয়ার বলে যাদের আমরা ঘৃণা করি, তারা মানুষ হিসাবে অনেক উদার। তারা মৌচাক ভেঙ্গে মধু জোগায়, সেই মধু খেয়ে শহুরেরা মনে বিষ সঞ্চয় করে। কিন্তু জংলীদের মন সেই মধুময়ই থেকে যায়।

ইলা ভাবে অসুস্থতার দরুণ সলিল হয়ত এত উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। তাকে আগে কখনও এমনভাবে একতরফা বলতে শোনেনি সে। আজ সে যুক্তি তর্কের ধার ধারে না।

ইচ্ছে করেই ইলা বিতর্কের যতি টানে। প্রসঙ্গটার মোড় ঘুরিয়ে দেয় সে।

তোমার আবৃত্তি অনেকদিন শুনিনি। একটা শোনাবে এখন?

সলিলের উত্তেজনায় ভাটা পড়ে। সে আরম্ভ করে—

'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি
কালো তারে বলে গাঁয়ের লোক...

মুগ্ধ হয়ে শোনে ইলা। উপযুক্ত পরিবেশে কবিতাটি যেন প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

হঠাৎ অদূরে সলিলের চোখে পড়ে কৈলিকে। সে কলতলার দিকে যাচ্ছে। মাথার উপর একটা কলসী। মাঝে-মাঝে সে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে। চোখ দুটো তার বিস্ময়ে ভরা। রাঙাবাবুর পাশে একজন মেম সাহেবকে দেখে তার কৌতূহল বেড়ে যায়। গাছের আড়ালে সরে গিয়ে সে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে। তারপর কলসীটা মাথার উপর থেকে নামিয়ে রেখে কৌতূহল দৃষ্টিতে দুজনের দিকে তাকিয়ে থাকে। সলিলের আবৃত্তির ছন্দ কেটে যায়।

ইলার চোখ এড়ায় না। ব্যঙ্গ করে সে বলে, তোমার আবৃত্তির জোরে দেখছি কৃষ্ণকলি এসে ধরা দিয়েছে।

সলিলের কানে বোধ হয় ইলার মন্তব্যটা পৌঁছেনি। সে কৈলির দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকে।

কবি, এই তব হৃদয়ের ছবি!

ইলার এই বিদ্রূপে সলিলের যেন চেতনা ফিরে আসে। সে তার হঠাৎ অন্যমনস্কতার জন্য লজ্জা বোধ করে।

ইলা সহাস্যে প্রশ্ন করে, আচ্ছা বলতে পার তোমাকে ডাক্তারী পড়ার পরামর্শ কে দিয়েছিল? তোমার হওয়া উচিত ছিল কবি।

মাথা নেড়ে সলিল জানায়, সত্যিই তাই।

ইলা জিজ্ঞেস করে, মেয়েটি কে ?

এখানকার সর্দার মাঝির মেয়ে।

আলাপ আছে ?

তা একটু-একটু আছে বৈকি।

আব্দারের সুরে ইলা বলে, একটু ডাকো না।

সলিল চেঁচিয়ে ডাকে, কৈলি, ও-কৈলি, এ দিকে এস, শোনো।

কৈলি কলসীটা গাছের গোড়ায় রেখে তাদের সামনে এসে দাঁড়ায়।

ইলা জিজ্ঞেস করে, তোমার নাম কি ?

কৈলি।

সলজ্জভাবে উত্তর দেয় কৈলি।

রাশি-রাশি প্রশ্নের মধ্যেও ইলা যেন আর প্রশ্ন খুঁজে পায় না। সে কৈলিকে ভাল করে লক্ষ্য করে। এমন সুগঠিত দেহ, চোখমুখ বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না। দেহটা যেন লাবণ্যে ভরপূর। চোখে-মুখে একটা অপূর্ব দীপ্তি।

আচ্ছা তুমি এসো।

কৈলি ক্ষিপ্র পদে চলে যায়। কলসীটাকে গাছের তলা থেকে উঠিয়ে মাথায় নেয় সে। তারপর আর একবার ঘাড় ফিরিয়ে আড় চোখে সলিল ও ইলার দিকে তাকিয়ে দেখে। তার মনে হয়, পাশাপাশি দুটো দেবতার মূর্তি যেন বসে রয়েছে। তার চোখে অপূর্ব লাগে। সে ধীরে-ধীরে এগিয়ে যায় টিউবওয়েলটার দিকে।

ইলা সলিলকে বারণ করে বেশীক্ষণ বাইরে বসতে। যদি হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে যায়, তাহলে জ্বরটা আবার আসতে পারে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সলিল উঠে পড়ে। আরো একটু বসতে পারলে তার মনটা যেন একটু খুশী হতো।

কৈলি মনে-মনে ধরে নেয় ইলাই রাঙাবাবুর বউ। বেশ বউ। দু-জনেরই রাঙাপারা দেবতার মত চেহারা। এই বেশ টুকুর মধ্যেও যেন একটা চাপা ঈর্ষা খেলে যায় তার মনে।

বাড়ী ফিরেই কৈলি সবাইকে বলে, সে রাঙাবাবুর বউ দেখে এসেছে। মেমসাহেব। দুধের মত সাদা পারা বঙ।

সর্দার মনে করে রাঙাবাবুর অসুখেব খবর পেয়েই হয়ত তার বউ এসেছে। সে কৈলিকে নির্দেশ দেয় কিছু সুন্দর ফুল দিয়ে আসতে। মেম সাহেব খুশী হবে।

এমন সুন্দর মানানসই বর-বউ কৈলি আর কখনও দেখেনি। তাই মনে-মনে সে আবাব দেখার সুযোগ খুঁজছিল। সর্দারের নির্দেশ পেয়ে সে খুসীই হয়। হীরাকে আড়ালে ডেকে বলে, রাঙাবাবুর বহু আইছে। হামার সাথে তু যাবি ?

হীরা খুশী হয়ে বলে, হামি যাবে বক্‌শিশ মাঙবে।

কৈলি হীরাকে বারণ করে দেয় বখশিশ চাইতে। সে চায় না বখশিশ চেয়ে নিজেদের ছোট করতে।

খুব ভোরে উঠে কৈলি আর হীরা নানারকম ফুল তুলে আনে। দুটো ফুলের তোড়া তৈরি করে দু-জনের জন্যে।

কৈলি একটা অপেক্ষাকৃত ভাল শাড়ী পরে। ডোরা কাটা নতুন শাড়ীখানা। সেদিন মেলা থেকে সর্দার কিনে এনেছে। গায়ে পরেছে একটা রঙিন ছিটের ব্লাউজ। হীরাও একটা ছোট্ট ধুতি পরে নিয়েছে। গায়ে পরেছে একটা ফতুয়া। বিশেষ উৎসবের দিন ছাড়া তারা এবকম পোষাক পরে না। সর্দার বোঝায়, শহরের লোকের কাছে গেলে ভাল পোষাকই পরতে হয়। তারা নোংরা জামা-কাপড় দু-চক্ষে দেখতে পারে না। ধোপ-দুরস্ত-পোষাক তারা পছন্দ করে।

কৈলি ও হীরা আসে ফুলের তোড়া দুটো নিয়ে। দু-জনের হাতে দুটো তুলে দেয়। একটা ফুলের তোড়া হাতে নিয়ে ইলা কৈলিকে পার্শ্বস্থ মোড়াটায় বসতে বলে। কৈলি বসে না। হীরা সলিলের কাছ ঘেঁসে দাঁড়ায়। সে বুঝিয়ে দিতে চায় মেম সাহেবকে, যে সাহেবের সঙ্গে তার ঘনিষ্টতা আছে।

আজ নতুন পোষাকে কৈলিকে চমৎকার মানায়। তার টানা টানা চোখ ও নিটোল চেহারা দেখলে মনে হয় সে যেন অজন্তা ইলোরার জীবন্ত মূর্তি। কালোরও যে একটা রূপ আছে, তা এই প্রথম উপলব্ধি করে ইলা। সলিল জিজ্ঞেস করে, অমন করে কি দেখছো ?

দেখছি তোমার আবিষ্কার, 'কৃষ্ণকলি'।

ইলা পার্শ্বস্থিত টিনের বাক্স থেকে দুটো কেক তুলে দু-জনের দিকে বাড়িয়ে দেয়।

কৈলি ইতস্তত করে। হীরা খুশী হয়ে হাত বাড়িয়ে নেয়।

নাও।

সলিলের নির্দেশে কৈলি কেকটা নেয়। তারপর ধীরে-ধীরে চলে যায় সে হীরার হাত ধরে।

বেশ পোষ মেনেছে তো দেখছি। খোঁচা দেয় ইলা।

তুমি ছাড়া সবাই পোষ মানে।

শাসনের ভঙ্গিতে তাকায় ইলা সলিলের দিকে।

জানো, বনের পাখী বনে উড়ে চলে যায়, ধরা দেয় না। শহরের পাখী খাঁচার মধ্যে ছটফট করে। শুধু গোঙানি সার। নিজে ভোগে ও মালিককেও ভোগায়। বলেই সলিল আড় চোখে তাকায় ইলার দিকে।

ইলা সলিলের যুক্তি মানে না।

খাঁচার পাখী মালিকত্ব স্বীকার করে এই তার বৈশিষ্ট্য।

তর্কটা যখন বেশ জমে উঠেছে, এমনি সময় বনবিহারী ট্রে করে চা আর বিস্কুট নিয়ে হাজির। তাকে দেখে সলিল মন্তব্য করে, বিহারীদার যদি একটুও রসজ্ঞান থাকে! যখনই ঝগড়াটা জমে ওঠে তখনই হঠাৎ যাত্রাদলের বিবেকের মত এসে হাজির হয়। সব পণ্ড করে দেয়, হোপলেস্।

ইলা বলে, বিহারীদা সিচুয়েশন বোঝে। পাকা হাড় কিনা তাই।

ইলাদি, ছোটবাবু হাড় কখানা আর পাকতে দিলে কই। ছেলে মানুষি করে কাঁচাই রেখে দিল।

একটা বিস্কুট দাঁতে কাটতে-কাটতে ইলা বনবিহারীকে উদ্দেশ করে বলে, এবার আমাকে ছুটি দাও, ছোটবাবুর শরীর অনেকটা সেরে উঠেছে।

বনবিহারী ইলার খোঁচার তাৎপর্যটা বুঝতে না পেরে অভিমানে ভেঙে পড়ে।

আমি জানি এখানে তোমার থাকতে কষ্ট হচ্ছে। ষ্টোররুমে থাকতে হয়, সময় মত আহার হয় না, তেমন যত্ন-আত্তিও করতে পারিনে।

ইলা হেসে বলে, আমি কি চেঞ্জে এসেছি? আমি এসেছি রোগী দেখতে।

বনবিহারীর মুখে একটা অপ্রসন্ন ভাব ফুটে ওঠে। সে পা বাড়ায় রান্নাঘরের দিকে। সে ভেবে ছিল দিদিমণির হাতে ছোটবাবুর ভার ছেড়ে দিয়ে কিছু দিনের জন্য সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে। কিন্তু সে-গুড়ে বালি। সে স্বগতঃ বলে, আমি আর ঝক্কি পোয়াতে পারি নে বাপু।

বনবিহারী চলে যেতেই সলিল ইলাকে বলে, ভেবেছিলাম আমার জন্য ভাববার লোক আছে। দেখছি, যে তিমিরে সেই

তিমিরে। 'অভাগা যেদিকে চায় সাগর শুকায়ে যায়'।

ইলা বিরক্ত হয়ে ওঠে।

এ সব গেঁয়ো কথা ছাড় দিকিন। উপমার নমুনা দেখলে হাসি পায়।

তবে হাসো, প্রাণ ভরে হাসো।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ইলা বলে, তুমি তো জানো, আমাব পরীক্ষার আর বেশী দেরী নেই।

যখন এসেই পড়েছ, অনুতাপ করে লাভ নেই।

অনুতাপ বলে কোন শব্দেব স্থান আমার অভিধানে নেই। কারণ, আমি ভেবে কাজ কবি, কাজ করে ভাবি না।

সলিল বোঝে ইলা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।

তাই সে বণে ভঙ্গ দেয়।

চলো ওঠা যাক। শেষে ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে।

তুমি যাও আমি আর একটু বসবো। বেশ ভাল লাগছে ঠাণ্ডা হাওয়া।

সলিল উঠে পড়ার সময় মনে করিয়ে দেয় ইলাকে জংলী পরিবেশের কথা। সঙ্গে-সঙ্গে ভয়ে ইলা উঠে পড়ে।

সশব্দে হেসে ওঠে সলিল।

সলিলের সঙ্গে ইলার প্রথম পবিচয় ঘটে মেডিকেল কলেজে। সে তখন থার্ড ইয়ারে পড়ে, সলিল পড়ে ফোর্থ ইয়ারে। সলিলকে সবাই চেনে ছাত্র ইউনিয়নের সেক্রেটারি হিসাবে। ব্যায়ামবিদ ও স্পোর্টস্‌ম্যান হিসাবে। প্রফেসর ও ছাত্রছাত্রী মহলে তার সুনাম ও খাতির যথেষ্ট।

ডাঃ সমীর সেন বিলাত থেকে একটা বড় ডিগ্রী নিয়ে এসে

সম্প্রতি প্রফেসর হয়েছেন। পাতলা ছিপছিপে গড়ন, বয়স পঁয়ত্রিশের মধ্যে। চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা, মুখে ইংরাজী বুলি, চলনে সাহেবী কায়দা।

একদিন তিনি উপযাচক হয়েই ইলাকে বলেন, মিস ঘোষ যদি কখনও কিছু জানবার, বোঝবার ইচ্ছে হয়, তাহলে বিনা-সঙ্কোচে আমার কাছে এসো। আমি সানন্দে সাহায্য করব।

প্রথমটা ইলা খুসীই হয়। কিন্তু বুঝতে তার বিলম্ব হয় না যে ডাঃ সেনের এই অযাচিত সাহায্যের অন্তরালে একটা বিশেষ স্বার্থ আছে। তার লোভী মার্জারেব দৃষ্টি তা প্রমাণ করে দেয়।

ইলা যথাসম্ভব এড়িয়ে চলে। কিন্তু সে যতই তাঁকে এড়িয়ে যেতে চায়, ডাঃ সেন ততই নানা অছিলায় যখন-তখন তাকে ডেকে পাঠান। একদিন তিনি তাকে ম্যাডিকেল ক্যারিয়ার তৈরি করে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু এ প্রতিশ্রুতি ইলার মনে উৎসাহ যোগায় না। শুধু ধন্যবাদ জানিয়ে সে বিদায় নেয়।

ডাঃ সেন ইলার পৈতৃক সম্পত্তির আঁচটা আগেই করে নিয়েছেন ইলার সহপাঠিনী সীমার মারফতে। তিনি চেয়েছিলেন ইলার পৈতৃক সম্পত্তিটা গ্রাস করতে। ছলেবলে কৌশ… যেভাবেই হোক। তাই তিনি বিয়েব প্রস্তাব করেছিলেন। প্রস্তাবটা ইলা প্রত্যাখ্যান করতেই তিনি তার বিরুদ্ধে অপপ্রচার সুরু করেন। দুষ্ট ছাত্রদের লেলিয়ে দেন তার পেছনে। তারা পরোক্ষে ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করে তাকে অতিষ্ঠ করে তোলে। অলক বসুও তাদের মধ্যে একজন। বড় লৌহ ব্যবসায়ী সমর বসুর একমাত্র পুত্র সে। বছর দুই ধরে ক্রমাগত ফেল করে একই ক্লাশে আছে। সুশ্রী স্বাস্থ্যবান যুবক উপযাচক হ'য়ে আলাপ করতে আসে ইলার সাথে। প্রথম প্রথম ভদ্রতার খাতিরে ইলা তার কথার

উত্তর দেয়।

আশ্চর্য প্রকৃতির মানুষ এই অলক। অপমান করে তাড়িয়ে দিলেও সে সহাস্যে ফিরে আসে। তার স্বরূপটা ইলার নিকট বেশীদিন গোপন থাকে না। অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের পার্টি দিয়ে অলক হাত করে নেয়। ইলার অবস্থা হয় অনেকটা বয়কট হওয়ার মত। সে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। নানারকম টিকা টিপ্পনিও তার কানে আসে। নিরুপায় হয়ে একদিন সে পিতৃবন্ধু সিনিয়র অধ্যাপক ডাঃ পালের সাহায্য ও উপদেশ চায়। অলক ও ডাঃ সেনের চক্রান্তের কথা সে তাঁকে অকপটে বলে।

ডাঃ পাল সব শুনে একটু ভেবে বলেন, এই দুষ্ট পঙ্গপালের বিরুদ্ধে আমার যুঝবার শক্তি নেই মা। এরা দুষ্ট ব্রণের মত। বড় কষ্ট দেবে জানি। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে আবার কি একটু ভেবে নিয়ে তিনি প্রশ্ন করেন, তুমি সলিলকে চেনো? সলিল রায় ছাত্র ইউনিয়নের সেক্রেটারি।

দেখেছি কিন্তু আলাপ নেই।

ছেলেটি চরিত্রবান। ঝক্কি সামলাবার মত সাহস ও শক্তি তার দু-ই আছে। সে তোমাকে এ বিপদ থেকে বাঁচাতে পারবে। আচ্ছা দাঁড়াও, আমিই তাকে ডেকে পাঠাচ্ছি।

তিনি চাপরাশীকে নির্দেশ দেন সলিলকে ডেকে আনার জন্য।

ইলা চলে যাবার উপক্রম করতেই ডাঃ পাল বললেন, যেয়ো না বসো। তোমার থাকার দরকার আছে।

খানিকক্ষণ পরে সলিল আসে।

স্যার, আমায় ডেকেছেন?

হ্যাঁ, বসো কথা আছে।

ডাঃ পাল ইলাকে দেখিয়ে বলেন, একে চেনো?

চিনি, কিন্তু আলাপ নেই।

তোমার বাবা যেমন আমার বন্ধু, এর বাবাও তেমনি আমার বন্ধু ছিলেন। ব্যারিষ্টার বীরেশ ঘোষের নাম নিশ্চয়ই শুনেছ। ইলা তারই একমাত্র মেয়ে।

সলিল হাতজোড় করে নমস্কার জানায় ইলাকে, ইলাও প্রতি-নমস্কার জানায়।

ডাঃ পাল আবার সলিলকে বলেন, শুধু পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য ডাকিনি। ওর একটু উপকার করার জন্যই তোমায় ডেকেছি।

ইলা মাঝে-মাঝে সলিলের নির্ভীক বীরত্বপূর্ণ চেহারাটার দিকে তাকিয়ে দেখে। তার চোখমুখ দেখে মনে হয় তাকে যেন বিশ্বাস করা চলে। তার উপর নির্ভর করা চলে।

ডাঃ পাল সংক্ষেপে সলিলের কর্তব্যটা বুঝিয়ে দেন। তারপর বক্তব্য শেষ করে তিনি মন্তব্য করেন, এই জন্যেই অনেকে মেয়েদের ডাক্তারী লাইনে দিতে চান না। ইলার বাবারও মত ছিল না। ইলা স্বাবলম্বী হবে বলে সে নিজেই ডাক্তারী লাইন বেছে নিয়েছে। সে তো কখনও ভাবতে পারেনি যে তাকে এরকম বিপত্তির মধ্যে পড়তে হবে। আমিও ভেবে পাইনে কেন যে শিক্ষিত ভদ্র সন্তানদের মাথায় এইসব দুর্বুদ্ধি চাপে। কোথায় ডাক্তারী পাশ করে সমাজের ও দেশের কাজে লাগবে, না যত সব!

একটা বিরক্তির ভাব ফুটে ওঠে তার চোখেমুখে।

সলিল চুপ করে থাকে।

ডাঃ পাল উত্তেজিত হয়ে বলতে থাকেন, একটি অসহায় ছাত্রীকে যদি তোমরা বিপদ থেকে রক্ষা করতে না পারো, তবে এত বড় সমাজকে রক্ষা করবে কি করে?

সলিল লজ্জা পায়। বিনীতভাবে সে বলে, স্যার, ভয় আমার নেই। তবে...

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ডাঃ পাল বল্লেন, একটা কথা মনে রেখো সলিল, অমানুষ তা সে যেই হোক, যে-স্তরেরই হোক না কেন তাকে শায়েস্তা করতেই হবে। এতে কিন্তু করলে চলবে না বাবা।

সলিল শেষপর্যন্ত কথা দেয়, ইলাকে সে যথাসাধ্য সাহায্য করবে।

পরদিন সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছিল মুষলধারে। হাসপাতালে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকের সংখ্যা খুবই কম। ডাঃ পালের চেম্বারের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ইলা ভাবে, একবার তাঁর সাথে দেখা করা উচিত। কারণ তিনি তাঁকে নিজের মেয়ের মত স্নেহ করেন। চেম্বারে প্রবেশ করেই ইলা হাতজোড় করে নমস্কার জানায়। মুহূর্তের মধ্যে তার ভুল ভেঙ্গে যায়। সে দেখে, ডাঃ পালের চেয়ারে বসে আছেন ডাঃ সেন। সে তক্ষুণি ফেরবার জন্য পা বাড়ায়।

দাঁড়াও বিশেষ কথা আছে।

কয়েক মুহূর্ত ইলা চুপ করে দাঁড়ায়। তারপর ভ্রূকুঞ্চিত করে প্রশ্ন করে, কি কথা বলুন?

তুমি নিশ্চয়ই নিজের ভুল বুঝতে পেরে ক্ষমা চাইতে এসেছো। বেশ, বেশ, আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম।

না, বেশ জোর দিয়েই ইলা বলে, ভেবেছিলাম ডাঃ পাল এখানে আছেন। তাঁরই সাথে দেখা করতে এসেছিলাম।

হো-হো করে হেসে ওঠেন ডাঃ সেন।

'দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না।' ইট ইজ ট্রু ফর্ অল্ এজেস্। বিশেষ করে···

ইলা গর্জে ওঠে, যা তা বলবেন না। আপনি না শিক্ষক। বলেই সে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করে।

ডাঃ সেন উঠে সজোরে তার একটা হাত ধরে ফেলেন।

বিশ্বাস করো ইলা, আমি তোমাকে...

ইলা একটা ঝাঁকুনি দিয়ে হাত ছাড়াবার বৃথা চেষ্টা করে। ডাঃ সেন তাকে সবলে বুকের সঙ্গে চেপে ধরেন। ইলা তার হাতের উপর সজোরে একটা কামড় বসিয়ে দেয়।

একবার উঃ করে ওঠেন ডাঃ সেন, কিন্তু তাকে ছাড়েন না।

অগত্যা ইলা চেঁচিয়ে ওঠে, অসভ্য, জানোয়ার, স্কাউণ্ড্রেল।

সলিল তখন দোতলার বারান্দা দিয়ে তার সহপাঠী অরিন্দমের সঙ্গে এদিকে আসছিল। ডাঃ পালের চেম্বারের কাছে আসতেই ইলার উক্তিটা তার কানে যায়। সঙ্গে সঙ্গে একটা ধস্তাধস্তির শব্দও তার কানে আসে। সে অরিন্দমকে নিয়ে ঝড়ের বেগে চেম্বারে প্রবেশ করে। তখনও ডাঃ সেন ইলাকে সাপটে ধরে আছেন, আর তাঁর ডান হাতের কব্জি থেকে রক্ত ঝরছে। আচমকা সলিল একটা ঘুষি মেরে ফেলে দেয় ডাঃ সেনকে। ডাঃ সেন ছিটকে পাশের টেবিলের উপর পড়েন। কপালে চোট লাগে তাঁর।

ইলার কপালে ও মুখে ঘামের বিন্দু দেখা দেয়। দেহটা তার কাঁপতে থাকে।

অরিন্দমও এগিয়ে যায় ডাঃ সেনের দিকে। কিন্তু সলিল তাকে বাধা দেয়, আর প্রয়োজন নেই, দেখছিস না হাত থেকে রক্ত ঝরছে। মিস্ ঘোষের কাছেই যথেষ্ট সাজা পেয়েছেন।

হোঃ-হোঃ করে সে বিদ্রূপের হাসি হেসে ওঠে। ডাঃ সেন নিজেকে সামলে নিয়ে সলিলকে শাসান, রাস্কেল, তোমাকে কলেজ থেকে বার করে দেবো।

সলিল ডাঃ সেনকে তীব্রভাবে ভর্ৎসনা করে, ছিঃ ছিঃ, আপনি এত নীচ, ভাবতেও ঘৃণা করে। শিক্ষক হয়ে ছাত্রীর সঙ্গে এমন নির্লজ্জ ব্যবহার করলেন। সমস্ত শিক্ষিত সমাজের মাথা হেঁট করে দিলেন।

ডাঃ সেন উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। সলিলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার উপক্রম করতেই অরিন্দম ক্রোধে ফেটে পড়ে এবং ডাঃ সেনের মুখে সে সজোরে একটা ঘুষি বসিয়ে দেয়।

ডাঃ সেন টাল সামলাতে না পেরে আবার পড়ে যান। গোলমাল শুনতে পেয়ে আশেপাশের কয়েকজন ছাত্রছাত্রী ও প্রফেসর ছুটে আসেন। সলিলের নির্দেশে অরিন্দম ইলাকে বাইরে নিয়ে যায়।

উপস্থিত সকলের সামনে ডাঃ সেনের স্বরূপটা প্রকাশ হয়ে পড়ে।

ইলার মনে পড়ে ডাঃ পালের বিদায় সম্বর্ধনার দিনটি। ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষ থেকে তাঁকে সাড়ম্বরে ফেয়ারওয়েল দেওয়া হয়।

তিনি ওজস্বিনী ভাষায় ডাক্তারদের কর্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

ডাক্তারদের অসহায় রোগীদের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে হবে। তাদের জন্যে ত্যাগ স্বাকার করতে হবে। শুধু অর্থ উপার্জনের জন্য এই বিদ্যা ব্যবহার করলে বিদ্যার অবমাননা করা হবে। যে দেশে বিনা পথ্যে, বিনা চিকিৎসায় হাজার হাজার লোক মারা যায়, সেখানে ডাক্তারদের করণীয় অনেক কিছু আছে। একটা কথা মনে রাখতে হবে, যে-বিদ্যা দরিদ্র জনসাধারণের ও সমাজের কোন কাজে আসে না, তা অবিদ্যারই তুল্য। বলাবাহুল্য অনেকেই ডাক্তারী বিদ্যাকে অর্থকরী বিদ্যা হিসেবে ব্যবহার করেন। দুঃখের বিষয় যে আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তরুণ তরুণীরা এই বিদ্যা

গ্রহণ করে, সে আদর্শ অনেকেই শেষ পর্যন্ত রাখতে পারে না। ফলে, চিকিৎসকের কর্তব্যের অবহেলা ঘটে। তারি ফলে জনসাধারণের নিকট প্রকট হয়ে ওঠে চিকিৎসকের ত্রুটি-বিচ্যুতি। তারা আস্থা হারায়।

সর্বশেষে তিনি বলেন, আমি অবসর গ্রহণের পর একটা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের ভার নিচ্ছি। এই প্রতিষ্ঠান অসহায় রোগীদের বিনা পয়সায় চিকিৎসা ও পথ্য জোগাবার দায়িত্ব নিচ্ছে। তোমাদের মধ্যে ডাক্তারী পাশ করে যদি কেউ এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করতে ইচ্ছুক হও, তাকে আমি সানন্দে গ্রহণ করবো। তবে সেবা কার্যে আত্মনিয়োগ করতে যারা ইচ্ছুক তাদেরই এগিয়ে আস' উচিত। কাবণ সেখানে আর্থিক স্বাচ্ছন্দের কোন সম্ভাবনা নেই।

ডাক্তার পালের বক্তৃতা শেষ হলে ইলা তাঁর চেম্বারে গিয়ে দেখা করে। কথা দেয়, পরীক্ষা পাশেব পর সে উক্ত প্রতিষ্ঠানে যোগদান করবে। খানিক পরে সলিলও এসে হাজির হয় একই উদ্দেশ্যে।

ডাঃ পালের চোখ-মুখ খুসীতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

এমন ছাত্র-ছাত্রীই চাই বাংলার ঘরে ঘরে। আম'র দৃঢ় বিশ্বাস তোমরা পারবে হাসিমুখে এ কঠিন ব্রত গ্রহণ করতে।

বাইরে এসে ইলা বলে, আমি ভাবতেই পারিনি, আপনি ডাঃ পালের আহ্বানে সাড়া দেবেন।

সলিল হেসে উত্তর দেয়, জীবনে অনেক সময় অভাবিত ঘটনাও ঘটে।

পরদিন সকালে ইলা এসে সলিলের কাছে বসে। বনবিহারী দু'কাপ চা ও কিছু খাবার দিয়ে যায়। খেতে-খেতে দু'জনের মধ্যে কথা হয়।

মনে পড়ে আমাদের সঙ্কল্পের কথা? জিজ্ঞেস করে ইলা।

সলিলের মনে অনেকগুলো এলোমেলো চিন্তা এসে জট পাকাচ্ছিল। চিন্তাগুলোর জট ছাড়াতে সে আপ্রাণ চেষ্টা করছিল। অন্যমনস্কভাবে সে জবাব দেয়, মনে পড়ে বৈকি।

বলো তো কি?

সলিল অন্ধকারে যেন হাতড়াতে থাকে।

হেসে ফেলে ইলা। যাক, আমিই মনে করিয়ে দিচ্ছি।

ডাক্তারী পাশ করে বিদ্যেটা জনহিতকর কাজে লাগানো, গরীব-দুঃখীদের সেবা করা, ডাঃ পালের নিকট কথা দেওয়া। সবই ভুলে গেলে! আশ্চর্য!

সলিল এমনি ভাব দেখায় যেন এ কথাটা তার বরাবরই মনে আছে। সে বিজ্ঞের মত বলে, পুলের কাছে না গিয়ে পুল পার হওয়া যায় না।

যুক্তিটা অস্বীকার করে না ইলা। সে বলে, তুমি পরীক্ষার পাট চুকিয়ে ফেলেছো। আমারটা শেষ হলে বাঁচি।

পরীক্ষা শেষ হলে কী করবে শুনি? প্রশ্ন করে সলিল।

দুজনে মিলে যে-ব্রত গ্রহণ করেছি, তারই উদযাপন করবো এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস তোমার পূর্ণ সহযোগিতা পেলে আমাদের ব্রত সার্থক হবে। গরীব দুঃখী রোগীদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। শুধু সরকারের উপর হা-পিত্তেশ করে চেয়ে থাকলে চলবে না।

ইলা এক নিঃশ্বাসে বলে যায় তার সঙ্কল্পের কথা।

উত্তরে সলিল বলে, সঙ্কল্প সার্থক করতেই হবে

ইলা লক্ষ্য করে, সলিলের অন্যমনস্কতা। তার সমর্থনের মধ্যে আন্তরিকতার আভাষ আগেকার মত নেই। নিতান্ত নির্লিপ্ত জবাব। কিন্তু সে নিরাশ হয় না।

মনে-মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে সে সলিলকে টেনে আনবে তাদের সঙ্কল্পের পথে। তার শক্তি সামর্থকে সে সমাজের উপকারের জন্যে কাজে লাগাবেই।

রাত্রে সলিল আর ইলা পাশাপাশি খেতে বসে। বনবিহারী পরিবেশন করতে করতে মুগ্ধ নয়নে দুজনকে দেখে। তার মনে হয় লক্ষ্মী-নারায়ণ যেন পাশাপাশি বসে আছে। দুজনে বেশ সুন্দর জুটী মানাবে। সে মনে-মনে তার আর্জিটা ঈশ্বরের নিকট পেশ করে। ওদের দুহাত যেন এক হয়।

প্রকাশ্যে ইলাকে উদ্দেশ করে সে বলে, দিদিমণি এবার একটা হিল্লে কর। আমি আর এ-বোঝা বইতে পারিনে।

ইঙ্গিতটা বুঝতে ইলার বিলম্ব হয় না।

বেশ তো কোলকাতায় ফিরে গিয়ে বড়বাবুকে বলো, একটা ডানপিটে বউ এনে দিতে। ইলা আড়চোখে তাকায় সলিলের দিকে, মুখে তার দুষ্টুমির হাসি।

বনবিহারী তাদের হাসি ঠাট্টার মধ্যে থাকে না। সে মশলা আনবার অছিলায় ষ্টোররুমের দিকে চলে যায়।

বনবিহারী চলে যেতেই সলিল ইলার কথার উত্তর দেয়।

ডানপিটে না ডানাকাটা পরী ?

ডানা কাটা হলে কী করে হবে ? তুমি যা চঞ্চল, তোমাকে ডানা দিয়ে সর্বক্ষণ আগলে না রাখলে চলবে না।

সবাই কী তা পারবে ?

সবার প্রশ্ন আসে না। যে দায়িত্ব নেবে, সে-ই বুঝবে

ইলা সলিলের দিকে তাকিয়ে অর্থপূর্ণ হাসি হাসে।

সলিলের থেকে থেকে মনে পড়ে কৈলির স্বাস্থ্যের বৈশিষ্ট্যটা। অফুরন্ত স্বাস্থ্যের ভাণ্ডার তার। বিশেষ করে সেদিনকার দৃশ্যটা তাকে যেন মাতাল করে তোলে। দূরে সরিয়ে রাখে ইলাকে তার অন্তর থেকে, দূরে বহু দূরে ময়নাপাড়ার গণ্ডির বাইরে। একটা জংলী মেয়ের চেহারার কাছে ইলার সাম্য-সুন্দর চেহারাটা যেন নগণ্য বলে মনে হয়। কৈলির স্বাস্থ্যের জৌলুসের কাছে তার সৌন্দর্য যেন ম্লান দেখায়। সলিল কল্পনার লাগাম ছেড়ে দেয়।

দুপুরের বিশ্রামের পরে ইলা আবার এসে বসে সলিলের কাছে। সে লক্ষ্য করে তার কপালের বলি-রেখাগুলো খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ইলাকে দেখে সলিল একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। এতক্ষণ অবান্তর চিন্তাগুলো যেন তাকে পাগল করে তুলেছিল। সে চেষ্টা করে তার স্বাভাবিক মানসিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে, সহজ হতে।

ইলা জিজ্ঞেস করে, ঘুমোওনি ?

ঘুমিয়েছি।

উত্তর শুনে ইলা হাসে।

তুমি যে ঘুমোওনি তার প্রমাণ রয়েছে তোমার চোখে ও কপালে। দেখলেই মনে হয় তুমি কোন বিষয়ে গভীর চিন্তা করছিলে।

সলিল যেন ধরা পড়ে যায় হাতে-নাতে। সে নিজেকে সামলে নিতে চেষ্টা করে।

প্রশ্ন করে, কি ভাবছিলাম বলো তো ?

ভাবছিলে, শ্যাম রাখি কি কুল রাখি।

বিষয়টাকে হাল্কা করার জন্য সশব্দে হেসে ওঠে সলিল।

তুমি দেখছি অন্তর্যামী।

অন্তরে যাকে ঠাঁই দিয়েছি তার খবরাখবর অন্তর্যামীই দেন। কারণ দায়টা তাঁর।

মনে-মনে সলিল খুসীই হয়। আজ এই অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে ইলা যেন তাকে বাঁচিয়ে দিল। এমন স্পষ্টভাবে এর আগে কোনদিন ইলা ভালবাসার ইঙ্গিত দেয়নি।

হঠাৎ বনবিহারীর গলার আওয়াজ শোনা গেল, দিদিমণি, আমি জল আনতে যাচ্ছি। এদিকে একটু লক্ষ্য রেখো।

ইলা টুলটা ছেড়ে রান্নাঘরের দিকে পা বাড়ায়। উদ্দেশ্য, দরজাটা বন্ধ করে সে আসবে।

হঠাৎ সলিলের মাথায় কি একটা খেয়াল চাপে। সে দুহাত দিয়ে ইলাকে আগলে ধরে আবৃত্তির সুরে বলে, 'যেতে নাহি দিব...'

ইলা ভর্ৎসনার সুরে বলে, একি ছেলেমানুষী হচ্ছে শুনি, ছাড়ো।

আবার ব্যতিক্রম ঘটে সলিলের আচরণে।

নিমেষের মধ্যে ইলার দেহটা যেন অক্টোপাশের বন্ধনে আটকা পড়ে। সে যতই চেষ্টা করে বন্ধনটা আলগা করতে, ততই নিবিড় ভাবে সলিল তাকে আকর্ষণ করে তার বুকের মধ্যে।

ইলা হতভম্ব হয়ে যায়। সে লক্ষ্য করে সলিলের চোখে যেন একটা অভাবিত দৃষ্টি ফুটে উঠেছে। সঙ্গে-সঙ্গে গরম নিঃশ্বাস এসে লাগছে তার মুখে ও কপালের উপর। সলিল যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। ইলার দীর্ঘ সবল দেহটাকে সে ভেঙে কুঁকড়ে যেন ছোট্ট করে দেয়। মুহূর্তের মধ্যে ইলা হয়ে ওঠে তার হাতের

ক্রীড়নক। তছনছ করে দেয় তার নরম পুষ্ট দেহটাকে। প্রতিবাদ করার শক্তিটুকু যেন হারিয়ে ফেলে সে। খানিকক্ষণ পর সলিলের সম্বিৎ ফিরে আসে। মুক্তি দেয় সে ইলাকে। ফিরে আসে নিজের বিছানায়। তারপর বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ে সে।

ইলা ঠিক করে নেয় তার মাথার চুল, অন্তর্বাস ও শাড়ী। তারপর বসে পড়ে সে গদি আঁটা বেতের মোড়াটার উপর। সলিলের এই অভাবিত উচ্ছৃঙ্খলতার কারণটা সে খুঁজে বেড়ায়। বাঁ হাতের উপর মাথাটা রেখে খানিকক্ষণ সে ভাবে। তার মনে পড়ে রোগীর বিভিন্ন রকমের আচরণের কথা। ওষুধ ও অলস চিন্তার প্রতিক্রিয়া। কিন্তু সলিলের এরকম আচরণের কথা সে ভাবতে পারে না। সে ধরে নেয় উত্তেজক ওষুধের প্রতিক্রিয়া। কিন্তু প্রকাশ্যে তাকে ব্যঙ্গ করতে সে ছাড়ে না। ভবিষ্যতের ভালর জন্যে।

হে বীর, চোখ তুলে দেখো, শিকার এখনও পালায়নি।

সলিল নরম বালিশের মধ্যে মুখটা আরো জোরে গুঁজে দেয়।

নরম তুলোর বালিশ তোমাকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না।

কথাগুলো যেন তীরের মত বিঁধে গিয়ে সলিলের বুকে। সে অপরাধীর দৃষ্টিতে একবার মুখ তুলে তাকাতে চেষ্টা করে ইলার দিকে। কী যেন বলতে চায় কিন্তু পারে না।

ইলা তাকে আঙ্গুলের ইঙ্গিতে নিরস্ত করে।

কৈফিয়ৎ দিয়ে, মাপ চেয়ে আর নিজেকে ছোট করো না। যথেষ্ট বীরত্বের পরিচয় দিয়েছো আশ্রিতের উপর জুলুম করে।

সলিলের অস্ফুট কৈফিয়ৎটা গুমরে ফিরে যায় কণ্ঠ-বিবরে।

ইলা ফিরে আসে সেদিনকার পরিবেশের প্রভাবের প্রসঙ্গে।

দেখলে তো, জঙ্গলের প্রভাব কেমন করে ধীরে-ধীরে শহরের

শিক্ষা রুচি ও সভ্যতাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, পশু প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তোলে।

ইলার প্রত্যেকটা কথা সলিলের পিঠে যেন তীব্র কশাঘাত করে। ব্যথা ও যন্ত্রণার ছাপ ফুটে ওঠে তার চোখে। ফর্সা মুখে একটা বেদনার নীল ছাপ দেখা যায়।

ততক্ষণে বনবিহারী পাতকূয়ো থেকে জল নিয়ে ফিরে এসেছে।

বৈকালিক চা খেতে-খেতে ইলা সলিলকে স্পষ্ট জানায়, আমি কালই রওনা হবো।

বনবিহারীর কানে কথাটা যেতেই সে বলে, তা হয় না দিদিমণি! যেতে হয় ছোটবাবুকে নিয়ে যাও। আমি আর ঝামেলা পোহাতে পারবো না। আবার অসুখে পড়ল বলে।

তুমি মাথা খারাপ করলে চলবে কেন বিহারীদা? তুমি যে তার নিজের লোক, কোলে-পিঠে করে তাকে মানুষ করেছো। আমি তো উড়ে এসে জুড়ে বসেছি, দুদিনেব জন্যে।

বনবিহারী ইলার কথা শুনে হেসে ফেলে।

সলিল নিশ্চল হয়ে বসে থাকে। তার যেন সব কথা বলা-কওয়া শেষ হয়ে গেছে।

চা খাওয়া শেষ হতেই ইলা অপ্রত্যাশিতভাবে প্রস্তাব করে।

চলো একটু বেড়িয়ে আসা যাক।

ইলা লক্ষ্য করেছে তার নিদারুণ ও অভাবিত ভর্ৎসনার পর থেকে কেমন যেন হয়ে গেছে সলিল। সে অত্যন্ত অন্যমনস্ক থাকে, এবং উদাসীনতার ভাব স্পষ্ট দেখা যায় তার আচরণে। এখন তার কাছ থেকে অশ্রদ্ধা ও অনাদর পেলে সে হয়ত বিগড়ে যেতে পারে। এই আশঙ্কায় ইলা আবার তার সহজ স্বাচ্ছন্দ্য ভাবটা ফিরিয়ে

আনতে চেষ্টা করে।

সলিল হ্যাঁ-না বলার শক্তিটুকুও যেন হারিয়ে ফেলে। কলের পুতুলের মত সে উঠে পড়ে। ইলার পাশে-পাশে সে হেঁটে চলে। খানিক দূরে নির্জন পরিবেশে এসে ইলা একটা বটগাছ দেখিয়ে বলে, এর নীচেই বসা যাক।

সলিল শিউরে ওঠে। তার মনে পড়ে এই গাছটার নীচেই সেদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে কৈলির হাত সে চেপে ধরেছিল। এ নিতান্ত অদৃষ্টের পরিহাস। চরম আঘাত করবার জন্যই যেন অদৃষ্ট তাকে এখানে টেনে এনেছে। তবে কী ইলা জানে সব। বুকের ভিতরটা তার দুরু-দুরু করে ওঠে। সে খানিকটা দূরত্ব রক্ষা করেই বসে। ইলা উঠে এসে তার কাছ ঘেঁসে বসে। তারপর তার বাঁ হাতখানা সে তার ডান হাতে তুলে নেয়। ব্যায়ামবীরের শক্ত মজবুত হাতটা একজন নারীর হাতে ক্রীড়নক হয়ে ওঠে। সলিল সসঙ্কোচে হাতটা সরিয়ে নিতে চেষ্টা করে। চারিদিক দেখে নিয়ে ইলা টিপ্পনি কাটে, এখানে কেউ নেই। নির্জন নিস্তব্ধ। একটা সামান্য নারীর কাছে তুমি ভয়ে সসঙ্কোচে কুঁকড়ে যাচ্ছো কেন ?···

কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়ে যদি তুমি আনন্দ পাও, আমার তাতে কিছু বলবার নেই। অপরাধীর কণ্ঠে জবাব দেয় সলিল।

সহানুভূতির স্বর ফুটে ওঠে ইলার কণ্ঠে।

আমি সত্যিই তোমাকে আঘাত করবার জন্য বলিনি। বলছি সহজ হবার জন্যে। তোমায় আমি ভুল বুঝিনি সলিল।

কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে আবার সে বলতে থাকে, তোমার মনে পড়ে সে-দিনগুলোর কথা, যখন তুমি একটা বিরাট ষড়যন্ত্রের হাত থেকে আমায় রক্ষা করেছিলে। ডাঃ সেন ও অলকের নেক্‌ নজর ও খপ্পর থেকে আমায় বাঁচিয়েছিলে, সে শক্তি, সাহস তোমার কোথায় গেল ? কোত্থেকে এ দুর্বলতা এলো ?

আজ কেন সে-কথা তুলছো ইলা। আমি আমার স্বার্থ মিটিয়ে নিয়েছি। প্রমাণ করে দিয়েছি বিনা স্বার্থে অতখানি তোমার জন্যে করিনি।

কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে আসে সলিলের। ইলার হাত থেকে সে নিজের হাতটাকে মুক্ত করে নেয়। নির্জীবের মত বটগাছটার গোড়ায় চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে। ইলা সরে এসে সলিলের মাথাটা নিজের কোলের উপর তুলে নেয়। তারপর তার মাথায় ঠাসা চুলের মধ্যে আঙুল দিয়ে বিলি কেটে দেয়। শান্ত শিশুর মত শুয়ে থাকে সলিল রক্ত-মাংসের উপাধানের উপর মাথা রেখে। এখন আর কোন চাঞ্চল্য নেই তার।

ইলা নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে।

আমার কি মনে হয় জানো?

কী?

"এই ভয় উঠে মনে, এই ভয় উঠে
না জানি পরাণ কাণু তিলে জনু টুটে।"

সলিলের মুখে হাসি ফোটে।

তোমার সাহস খুব বেড়েছে দেখছি।

যথা—

যথা, এইখানে এমনভাবে একটি যুবকের মাথা কোলে নিয়ে বসে বেশ বৈষ্ণব পদাবলী আওড়াচ্ছ। কেউ যদি দেখে ফেলে?

জান তো, পরিবেশের প্রভাবে সাহসের বাড়তি-কমতি হয়। খোঁচাটা দিয়ে ইলা চুপ করে থাকে।

সলিলের মুখটা পাণ্ডুর হয়ে ওঠে। ইলার মনটা সহানুভূতিতে আবার ভরে ওঠে। সে বিষয়ান্তরের অবতারণা করে। একটু ভেবে নিয়ে ইলা ফিরে আসে তাদের সঙ্কল্পের কথায়।

আমার সন্দেহ হয় তুমি শেষ পর্যন্ত তোমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা

করতে পারবে কিনা।

পারবো, নিশ্চয়ই পারবো ইলা। যদি আমার পাশে থাকো তাহলে আমি সব কিছুই পারবো। তুমি না থাকলে আমি বল পাইনে, সাহস পাইনে, আমি যেন হারিয়ে যাই।

ইলা বলে, তোমার আহ্বানে আমি সব সময়ই সাড়া দেবো, সহযোগিতা করবো। তুমি কথা দাও, ডাঃ পালের নিকট যে ব্রত গ্রহণ করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছো তা রক্ষা করবে।

ইলার চোখে-মুখে ক্ষণিকের জন্য দৃপ্তভাব ফুটে ওঠে।

সলিল আগে ইলাকে এমন দৃঢ়ভাবে কথা কইতে দেখেনি। ইলা সত্যি আজ অনেকটা বেপরোয়া হয়ে ওঠে। সে স্থির করে সলিলকে এভাবে উৎসন্নে যেতে দেবে না। সে নিশ্চিত জানে, তার কাছ থেকে আঘাত পেলে সলিল বদলে যেতে পারে। কাজেই সে স্বীয় আঘাতটা উপেক্ষা করে তাকে সুপথে আনতে চেষ্টা করে।

হঠাৎ একটা জানোয়ারকে ঝোপ থেকে ছুটে বেরিয়ে যেতে দেখেই ইলা ভয়ে আঁতকে ওঠে। সলিলের বুকের মধ্যে মাথাটা গুঁজে দিয়ে ভয়টাকে সামলে নেবার চেষ্টা করে।

সশব্দে হেসে ওঠে সলিল।

ও নিশ্চয়ই একটা শেয়াল। ইলার বুকের ধড়ফড়ানি তখনও কমেনি। সে কম্পিত কণ্ঠে বলে, এখন ওঠা যাক।

দুজনে পা বাড়ায় লালকুঠির দিকে।

লালকুঠিতে ফিরেই ইলা আবার স্পষ্ট ঘোষণা করে, আমার কিন্তু কাল যাওয়াই ঠিক।

সলিল অনুরোধ জানায়, আর দুটো দিন থেকে যাও ইলা, এক সঙ্গেই ফিরবো।

আমি আর অপেক্ষা করতে পারিনে! তুমি থাক। গাড়ীর জার্ণি সহ্য করার ক্ষমতা তোমার এখনও হয়নি।

এ কঠিন রায়ের বিরুদ্ধে সলিল আপিল করার মত কোন যুক্তি খুঁজে পায় না।

সলিলের সন্দেহ হয়, ইলা হয়ত মার অনুমতি নিয়ে আসেনি। তাই সে তাড়াতড়ি ফিরে যেতে চাইছে।

ইলাকে এ প্রশ্ন করতেই সে সহাস্যে উত্তর দেয়, মার অনুমতি নিয়ে এসেছি এবং তিনি খুসী হয়েই মত দিয়েছেন। কারণ তিনি জানেন তার মেয়েকে। মেয়েও নিজেকে জানে।

সে আরও বলে, মার মনে কোন সংকীর্ণতা নেই। এই জন্য আমিও গর্ব বোধ করি।

ইলার কোলকাতায় ফিরে যাওয়ার কথা কৈলির কানে যায়। বিহারী তাকে পাতকূয়োর কাছে দেখা হলে সংবাদটা জানায়। কৈলি প্রশ্ন করে, বহুর সাথে রাঙাবাবু যাবেনি ?

বনবিহারী হেসে ফেলে কৈলির প্রশ্ন শুনে।

সে জানায়, মেমসাহেব রাঙাবাবুর বহু নয়, বন্ধু।

এই সহজ কথাটা কৈলির মাথায় আসে না। কেমন যেন তাল-গোল পাকিয়ে যায়। পুরুষ লোকের বন্ধু মেয়ে মানুষ একই বাড়ীতে থাকে, এ কেমন করে হয় ?

বোবার মত খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে সে বনবিহারীর দিকে। তারপর সারাটা পথ চলতে-চলতে সে ভাবে বনবিহারীর কথাটা। তবে কি রাঙাবাবু লোকটা ভাল নয়। একটা সন্দেহ উঁকি দেয় তার মনে।

সলিলের সম্বন্ধে তার ভাল ধারণাটা ধীরে-ধীরে যেন ফিকে হয়ে

আসে। কিন্তু তাকে অবিশ্বাস করতেও তার মন সায় দেয় না একটা 'কিন্তু' থেকে যায়।

পরদিন সকালে ইলা রওনা হয়।

সর্দারের সঙ্গে কৈলি আর হীরা আসে। ইলা তার ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে দুটো এক টাকার নোট বার করে, একটা দেয় সে কৈলির হাতে, আর একটা হীরার হাতে।

সর্দার মাঝি বারণ করতে যায়।

ইলা বলে, ওদের হাট থেকে মিষ্টি এনে দিও তোমাদের পরবের দিনে।

কৈলি কয়েকটা ফুল এনেছিল, ইলার জন্য। ইলা খুসী হয়ে হাতে নেয় গন্ধহীন জংলী ফুল কটা।

সাঁওতাল ছেলেমেয়ের দল ইলাকে আবার ঘিরে দাঁড়ায় বখশিশের আশায়।

কিছু খুচরো পয়সা ছড়িয়ে দেয় ইলা পথের একপাশে। সঙ্গে সঙ্গে পথটা পরিস্কার হয়ে যায়। ইলা দ্রুত পা চালায়। খানিকটা পথ এসে সে সলিলকে অনুরোধ করে, তুমি ফিরে যাও, ঠাণ্ডা লাগলে আবার শরীর খারাপ হবে।

সলিল তার কথার জবাব না দিয়ে এগিয়ে যায়।

ইলা আবার বারণ করে।

সলিল বলে, এটুকু হাঁটলে ক্ষতি হবে না।

লাভ-ক্ষতি তুমি মোটেই বোঝ না, ফেরো। বলেই ইলা দাঁড়িয়ে পড়ে।

অগত্যা সলিলকে ফিরতেই হয়।

বনবিহারী ইলাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে ফিরে আসে।

বাসায় ফিরতেই সলিলের মনে হয়, ইলার সঙ্গে চলে গেলেই ভাল হোত। তার মনের সমস্ত শক্তি যেন ইলার সঙ্গে চলে গেছে। সে তার অবসন্ন দেহটাকে এলিয়ে দেয় তক্তাপোষের উপর।

বেশ খানিকক্ষণ পর বনবিহারী ফিরে আসে। সলিলের ঘরে মেঝের উপর ধপাস করে সে বসে পড়ে। একটু জিরিয়ে নিয়ে সে স্বগত বলে, মেয়ের মত মেয়ে একটা। চেহারাটা যেন মা দুর্গার মত, দেখলে ভক্তি হয়, মা বলে ডাকতে ইচ্ছে হয়।

সলিল বিরক্ত হয়ে ওঠে।

এখন বাজে বোকো না তো, নিজের কাজে যাও।

বনবিহারী আহত হয় মনে-মনে।

তাই যাচ্ছি।

ঘণ্টাখানেক বাদে সে ফিরে এসে সলিলকে ব্যঙ্গের সুরে জিজ্ঞেস করে, বাবুর চান হয়েছে?

বাবু কথাটা সে বেশী বিরক্ত হলে ব্যবহার করে থাকে।

সলিল উঠে বসে।

আজ আর চান-ফান হবে না।

কেন হবে না শুনি?

আমার ইচ্ছে।

তবে এসো, খেয়ে উদ্ধার করে দিয়ে যাও। শরীর খারাপ হলে আমাকে দোষ দিতে পারবে না বলছি।

গজ-গজ করতে করতে বনবিহারী রান্নাঘরের দিকে পা বাড়ায়।

ট্রেন ছাড়তেই ইলার মনে ইতস্ততঃ কতকগুলো স্মৃতি এসে জড়ো হয়। কোলকাতার কথা, ময়না পাড়ার কথা, সলিল বনবিহারী ও কৈলির কথা।

সলিলের ক্লিষ্ট, রুগ্ন পাণ্ডুর মুখখানার কথা মনে হতেই তার বুকের ভিতরটা অনুকম্পা ও সহানুভূতিতে ভরে ওঠে। সঙ্গে-সঙ্গে তার মনে হয় সে যেন অনেকটা রূঢ় এবং অশোভন আচরণ করে ফেলেছে তার প্রতি। অতটা বাড়াবাড়ি না করলেও হত। সে এসেছিল সলিলকে তাড়াতাড়ি সুস্থ করে তুলতে। কিন্তু উল্টে তার প্রতি অভিভাবকত্ব ফলিয়ে গেছে। তাকে ব্যঙ্গ করে, কথার মার-প্যাঁচে জব্দ করেছে। সে জানে সলিল সরল-সহজ। তাব মনে কোন আবিলতা নেই। জেনে-শুনেও সে ইচ্ছে করেই সেদিন তার অশোভন আচরণের জন্যে তাকে বাক্যবাণে জর্জরিত করেছে। বেশ করেছে সে। এর প্রয়োজনীয়তা ছিল। মনে-মনে সে নিজেকে সান্ত্বনা দেয়। সে চায় সলিলকে শেখাতে, বিষয়ের গুরুত্ব দিতে, গাম্ভীর্য বজায় রাখতে, ব্যক্তিত্ব বাড়াতে, কারণ এর মধ্যে তার নিজের ভবিষ্যৎ স্বার্থও জড়িত।

ইচ্ছা করেই সে সেদিন বটগাছটার নীচে বসে সলিলের মাথাটা কোলে তুলে নিয়েছিল। তার পক্ষে কী করে সম্ভবপর হয়েছিল তা সে ভেবে এখন অবাক হয়ে যায়। যে-পরিবেশের প্রভাবের কথা সে সলিলকে ব্যঙ্গের ছলে ইঙ্গিত দিয়েছিল তা থেকে সে নিজেও রেহাই পায়নি। অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া।

সলিলের অন্যমনস্কতা ও উদাসীনতা দেখে তার মনে আশঙ্কা হয়েছিল। মনে আঘাত পেয়ে হয়ত সে তার সঙ্কল্প থেকে বিচ্যুত হতে পারে। তাই, সে স্বেচ্ছাপূর্বক অতখানি এগিয়ে গিয়েছিল, ধরা দিয়েছিল।

এক এক বার ইলার মনে হয়, সলিলকে নিয়ে ফিরলেই হয়ত ভাল হত। আবার তার স্বাস্থ্যের কথা মনে হতেই সে তার যুক্তি খণ্ডন করে। আরো কিছুদিন থেকে সে সুস্থ হয়ে উঠুক। সে সম্পূর্ণ সুস্থ-সবল হোক এই তার কাম্য।

বিকেলের দিকে বনবিহারী যথারীতি এক কাপ চা ও বিস্কুট এনে দেয় সলিলকে।

সলিল প্রশ্ন করে, মাসটা শেষ হতে আর কত দেরী বিহারীদা?

অতশত হিসাব রাখিনে, তবে দুদিন বাদেই দোল-পূর্ণিমা। ভাবছি হাটে গিয়ে রঙ কিনে আনবো।

সলিল বনবিহারীকে রাগাতে ভালবাসে। বলে, বুড়ো বয়সে রঙ ধরেছে দেখছি।

আমোদ-আহ্লাদ রঙ-রস কি শুধু জোয়ানদেরই একচেটিয়া নাকি!

সলিল হেসে ফেলে বুড়োকে উত্তেজিত হতে দেখে।

বনবিহারী প্রতি বৎসরই দোল পূর্ণিমার দিন ডালি সাজিয়ে মন্দিরে পূজা দেয়। এবারও সে পূজা দেবে বলে স্থির করে। তাই সে সর্দারকে দিয়ে হাট থেকে কিছু ফাগ কিনে এনে রান্নাঘরের তাকে রেখে দিয়েছে। উদ্দেশ্য, দোল-পূর্ণিমার দিন মন্দিরে পূজা দিতে যাওয়ার সময় ফাগটুকু সঙ্গে নেবে।

দোলের আগের দিন রাত্রে বনবিহারী সলিলকে স্মরণ করিয়ে দেয়, কাল হোলি, আমি কিন্তু মন্দিরে যাবো পূজো দিতে। এক কোশের পথ ফিরতে দেরী হবে।

বৃদ্ধ বনবিহারী তার সাধ, আকাঙ্ক্ষা সব বিসর্জন দিয়ে সলিলের সাথে জঙ্গলে পড়ে আছে। তার বিনিময়ে কোনদিন এতটুকু আব্দার করেনি। আজ যখন, আব্দার জানিয়েছে, তখন তা' প্রত্যাখ্যান করা ঠিক হবে না। এই ভেবে সলিল সম্মতি দেয়. বেশ তো যাবে।

তোমার খাওয়ার কি ব্যবস্থা হবে?

ষ্টোভে যাহোক কিছু করে নেবো। এক বেলায় মরে যাবো না। হেসে উত্তর দেয় সলিল।

খুসী হয়ে বনবিহারী বলে, জন্মে-জন্মে যেন তোমার মত মনিব পাই, ছোটবাবু।

পরদিন খুব ভোরে বনবিহারী রওনা হয় মন্দিরের উদ্দেশ্যে। চা ও চিনির খোঁজে সলিল রান্নাঘরে গিয়ে কৌটোগুলো হাতড়ে দেখে। তার চোখে পড়ে কাগজের মোড়কে কিছু লাল রঙের ফাগ রয়েছে। বনবিহারী নিশ্চয়ই ভুলে গেছে এটা সঙ্গে নিতে। আবার ঘুরে আসতে হবে তাকে। সে তাকে জব্দ করার জন্য রঙটুকু এনে তার নিজের ঘরের কুলঙ্গিতে রেখে দেয়।

অনেকটা পথ এগিয়ে গিয়ে বনবিহারীর মনে পড়ে ফেলে-আসা ফাগের মোড়কটার কথা। আবার অতখানি পথ হেঁটে ফিরে যেতে তার মন চায় না। সে ক্লান্তি বোধ করে। সে স্থির করে, কারো কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে অথবা মূল্য দিয়ে ফাগ কিনে নিয়ে পূজোটা সেরে আসবে।

বিকেল হতেই কৈলি আসে কলতলার দিকে জল নিতে। জল নেওয়া হলে, সে ভাবে একবার বুড়োকে ও রাঙাবাবুকে দেখে গেলে হয়। রান্নাঘরের কাছে এসে দেখে যে বুড়ো নেই। তারপর সে দাওয়ায় এসে উঁকি মারে সলিলের ঘরের দিকে। তাকে দেখে সলিল ডাকে. এস কৈলি।

কৈলি ভেবেছিল বিহারী যখন রান্নাঘরে নেই, তখন হয়ত রাঙাবাবুর ঘরে আছে। সে সলিলকে জিজ্ঞেস করে, বুড়া কুথা গেছে?

শহরে পূজো দিতে গেছে। আজ হোলি কিনা।

তু মন্দিরে যাবে না ?

না।

সলিলের হঠাৎ মনে পড়ে রঙের মোড়কটার কথা। সে সম্মুখের কুলঙ্গি থেকে লাল ফাগের ঠোঙাটা পেড়ে নেয়। আত্ম-মর্যাদা ও পরিবেশের কথাটা ক্ষণিকের জন্যে ভুলে যায় সে।

কৈলি মোড়কটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করে, ইটা কি ?

তার কথার কোন জবাব না দিয়ে, সলিল ক্ষিপ্র হস্তে এক মুঠো ফাগ তার মুখে মাখিয়ে দেয়। কৈলি ছুটে পালাতে চেষ্টা করতেই সলিল এক হাত দিয়ে তাকে সজোরে চেপে ধরে অপর হাত দিয়ে তার মাথা, মুখ ও গলা ফাগ দিয়ে লাল করে দেয়।

ক্ষিপ্ত হয়ে কৈলি তাকে সজোরে ধাক্কা মেরে সরিয়ে নিজেকে মুক্ত করে নেয়। পালাতে চেষ্টা করে সে। কাছেই জলের একটা বালতি ছিল। বালতি থেকে জল নিয়ে সলিল ছিটিয়ে দিতে থাকে কৈলির দিকে। সঙ্গে-সঙ্গে সে হেসে ভেঙ্গে পড়ে। ফাগ আর জলে মিশে কৈলির শাড়ীর রঙ লাল হয়ে যায়।

কৈলি ছুটে যায় তাদের ডেরার দিকে। বাড়ীতে এসেই সে লুটিয়ে পড়ে ঘরের মেঝেতে।

সর্দার তখনও বাড়ী ফেরেনি। সে গিয়েছে হাটের মেলায় হীরাকে নিয়ে।

কৈলির মা তার অবস্থা দেখে চিৎকার করে ওঠে, তুকে কে রঙ দিছে ?

কৈলি কোন উত্তর দেয় না। শুধু ডুকরে-ডুকরে কাঁদতে থাকে। কৈলির মার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ে।

কে এই সর্বনাশ করলে ?

সলিল ষ্টোভের সাহায্যে দুপুরের রান্নাটা সেরে নেয়। ডিম ভাতে, ঘরে ঘী আছে, কাজেই খাওয়ার পাট শেষ করতে তার বিশেষ দেরী হয় না।

খাওয়া শেষ করে সে বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবে। হোলির দিনটা তার বেশ আনন্দেই কাটল। কৈলিকে খুব করে রঙ মাখিয়ে দিয়ে সে তৃপ্তি অনুভব করে। এমন ভাবে হোলির দিনটা তার সার্থক হবে তা সে আগে কল্পনাও করতে পারেনি। ভাগ্যিস বনবিহারী রঙ-এর মোড়কটা ভুলে ফেলে গিয়েছিল।

থেকে থেকে কৈলির সলজ্জ ও জড়তার কথা মনে পড়ে। এর আগে কোনদিন সে তার এমন সলজ্জ ভাব দেখেনি। এ যেন তার নতুন রূপ, নতুন ভাবে দেখা দিয়েছে। সেদিন সন্ধ্যায় শালবনের মধ্যে কৈলির যে রূপ দেখেছে, সে রূপ আর আজকের রূপের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। সলিলের ভাবতে বেশ ভাল লাগে।

সর্দারের হাট থেকে ফিরতে রাত্রি হয়। সে ঘরে ঢুকতেই কৈলির মা জানায়, কৈলির গায়ে কে রঙ দিয়েছে, কিন্তু সে কিছুতেই নাম বলছে না।

হিংস্র পশুর মত গর্জে ওঠে সর্দার। কৈলির কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, তুকে কে রঙ দিছে বল ?

কৈলি তার বাপের হাতের টাঙিটা দেখে ভয় পায়, কেঁপে ওঠে। মুখে তার উত্তর জোগায় না। আবার গর্জে ওঠে সর্দার। হিংস্র জানোয়ারের চোখের মত তার চোখ দুটো জ্বলতে থাকে।

কম্পিত কণ্ঠে কৈলি বলে, লালকুঠির রাঙাবাবু।

সর্দার চিৎকার করে ওঠে।

আমি লালকুঠি যাবে। হামার বিটির যে ইজ্জত লিছে উর আমি জান লিবে।

আতঙ্কে শিউরে ওঠে কৈলি।

সর্দারের চিৎকার শুনে আশে-পাশের কয়েকজন সাঁওতাল মাঝিও ছুটে আসে। তারা ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে সর্দারের পিছু-পিছু আসে লালকুঠিতে। প্রত্যেকেরই কাঁধে একটা করে টাঙি। প্রতিহিংসায় গজরাতে থাকে তারা।

বনবিহারী সবে মাত্র ফিরেছে। জামা-কাপড় ছাড়বার জন্যে সে নিজের ঘরে গিয়েছে।

সলিল বসে রয়েছে তার নিজের ঘরে।

শঙ্কু সর্দারের গর্জন শুনে বনবিহারী চমকে ওঠে। সে ত্রস্তে বাইরে এসে জিজ্ঞেস করে, কি হয়েছে সর্দার? অত চেঁচাচ্ছ কেন?

তুর বাবু কেনে হামার বিটির গায়ে রঙ দিছে? হামার বিটির বিহা না হোবে। ইজ্জত গিছে।

বনবিহারী এই রঙ দেবার ব্যাপারটা কিছুই জানে না। তাই সে হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে সর্দারের দিকে। হঠাৎ তার মনে পড়ে, মেঝেতে ফাগের গুড়ো পড়ে থাকতে দেখেছে।

হামি উর কৈফিয়ৎ মাঙবে, বিচার মাঙবে, গর্জে ওঠে সর্দার। হতভম্ব হয়ে যায় বনবিহারী সর্দারের নালিশ শুনে। সে ভেবে পায় না এর কি উত্তর দেবে। সে সর্দার ও অন্যান্য মাঝিদের বসতে বলে, চেঁচাতে বারণ করে। আশ্বাস দেয়, এর ফয়সালা সে করবে।

ঘরে ঢুকে বনবিহারী জিজ্ঞেস করে সলিলকে ব্যাপারটা সত্যি কিনা।

সলিল অস্বীকার করে না।

কিন্তু হোলির দিনে রঙ দেওয়ার গুরুত্বটা সলিল খুঁজে পায় না। ব্যাপারটা যে এত গুরুতর হয়ে উঠবে তা সে কল্পনাও করতে পারেনি।

বনবিহারী আবার বাইরে আসে। তখনও সর্দার মাঝি রাগে কাঁপছে। অন্ধকারের মধ্যে তার চোখ দুটো যেন হিংস্র বাঘের চোখের মত জ্বলজ্বল করছে। বনবিহারী অন্যান্য মাঝিদের উদ্দেশ করে বলে, তোমরা এখন যাও। সর্দার শঙ্কু থাক। তার সঙ্গে ফয়সালার কথা হবে।

বনবিহারীর কথায় তারা এক পাও নড়ে না, অবিশ্বাসের হাসি হাসে।

হাম না যাবে। হামি গেলে তু সর্দারকে বখশিস দিবে। সর্দার তুর বাত মানবে, ইজ্জত বিচবে।

সর্দার চেঁচিয়ে প্রতিবাদ জানায়, হাম বখশিস না লিবে ; বাবু লোগের জবান না মানবে। হামার মাঝি লোগের সমাজ আছে, ইজ্জত আছে। হামি জানোয়ার না আছে।

নরম কণ্ঠে বনবিহারী জিজ্ঞেস করে, তোমরা কি চাও ? খুলে বল।

সব খুলে বলে সর্দার। তাদের সামাজিক নিয়মের গুরুত্বটা শুনে আঁতকে ওঠে বনবিহারী। আজকের দিনে তাদের সমাজের কোন যুবতীকে তার মরদ ছাড়া অন্য কেউ রঙ দিতে পারে না। যে দিবে তাকে সেই মেয়েকে বিয়ে করতে হবে।

বনবিহারীর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে।

সে মিনতির সুরে সর্দারকে বলে, দেখো সর্দার, অন্য কোন উপায় আছে কি না। কোন প্রায়শ্চিত্ত, পূজা, খেসারতি ?

না, না, আউর কুছ উপায় না আছে।

ক্রুদ্ধ হয়ে উত্তর দেয় সর্দার।

অগত্যা বনবিহারী আজ রাতটুকু সময় চায়।

বনবিহারীর প্রস্তাব শুনে সর্দার ক্রুর হাসি হাসে। হাম যাবে তু লোগ ভাগবে।

বিশ্বাস করো সর্দার পালাবো না।

হাঃ হাঃ, সশব্দে হেসে ওঠে সর্দার। পরে হাসির বেগ সামলে সে বলে, হাম তুর কথা বিশ্বাস না কোরবে। তুলোগ শহরেব বাবু আছে, শয়তান আছে। হামাদের দুষমন আছে।

বিহারী আবার প্রতিশ্রুতি দেয়, কাল সকালে সে ফয়সালা করবেই।

শেষে সর্দার অন্যান্য মাঝিদের বুঝিয়ে বিদায় করে দিয়ে সে নিজে পড়ে থাকে বারান্দায়। সারারাত সে হিংস্র বাঘের মত জ্বলজ্বল চোখে তাকিয়ে থাকে। সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, কেউ পালাবার চেষ্টা করলেই তাকে টাঙি চালিয়ে টুকরো-টুকরো করে কেটে ফেলবে। তারপর শকুনের সম্মুখে ছড়িয়ে দেবে তার মৃতদেহ। মাঝে-মাঝে সে টাঙির তীক্ষ্ণতা পরখ করে দেখে।

বনবিহাবী ঘরে এসে সলিলকে জানায়, এ ড় কঠিন ঠাঁই, ছোটবাবু।

বিহারীদা! কাতর কণ্ঠে ডাকে সলিল।

বিয়ে করা ছাড়া গত্যন্তর নেই ছোটবাবু।

আঁতকে ওঠে সলিল। কৈফিয়ৎ দেয় সে, যুক্তি দেখায়, হোলির দিন রঙ দেওয়া অপরাধ নয।

আমাদের সমাজে যা অপরাধ নয়, অপরের সমাজে তা অপরাধ হতে পারে, এটুকুন শেখনি? এক দেশের বুলি, অন্য দেশের গালি।

বনবিহারী মনে-মনে নিজেকে ধিক্কার দেয়। সলিলকে একা রেখে যাওয়া তার মূর্খতা হয়েছে। তারই একবেলার গাফিলতিতে

রায় পরিবারের মান, সম্ভ্রম, যশ ডুবে যেতে বসেছে। এর জন্যে দায়ী সে নিজে।

সলিল আবার যুক্তি দেখাতে চেষ্টা করে।

ধমকের সুরে বনবিহারী বলে, চুপ করো, ফুর্তি করার সময়, এ কথা মনে ছিল না। সাঁওতাল হলেও তাদের সমাজ আছে, মান-ইজ্জত আছে।

আর কি কোন উপায় নেই বিহারীদা? কাতর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে সলিল।

দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দেয় বনবিহারী, না আমি মোটা বখশিশের লোভ দেখিয়েছি, খেসারতি দিতে স্বীকার করেছি, সর্দার মানলো না।

বনবিহারীর মনে পড়ে সর্দারের অনুশোচনার কথা, আমার কি দুর্মতি হলো, আমার কি খেয়াল হলো। সেই লালকুঠির কাজই হাতে নিলাম, ফরমাশ খাটলাম। পাপ হলো, আমার মেয়ের ইজ্জত গেলো

পরদিন বনবিহারী সকালে সর্দারকে জানাল, আমরা কৈলিকে শহরে নিয়ে যাবো। সেখানে গিয়ে কৈলির সাথে রাঙাবাবুর বিয়ে দেবো।

বনবিহারীর প্রস্তাব শুনে সর্দার হেসে ভেঙ্গে পড়ে।

তু লোগ শয়তান, শহরে লিয়ে আমার বিটিকে মারবে, ভাগিয়ে দিবে, হামি সব জানে।

বিশ্বাস করো সর্দার।

হাম তুকে বিশ্বাস না করে।

আর তর্ক করা চলে না।

বনবিহারী ভেতরে এসে সলিলকে পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝিয়ে বলে।

সলিল ভাবে একবার সে নিজে শেষ চেষ্টা করবে। বনবিহারী

নিরস্ত করে তাকে।

তোমায় দেখলে তারা হয়ত আক্রমণ করবে, পালাবার চেষ্টা করলে টাঙি চালাবে।

আতঙ্কে শিউরে ওঠে সলিল।

পরদিন সাঁওতালরা এক প্রকার জোর করে তাদের সামাজিক নিয়মে কৈলির বিয়ে দেয় সলিলের সাথে। নীরব অসহায় সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে বনবিহারী। হাঙ্গামা মিটে যেতেই সে বলে, ছোট বাবু, কলকাতায় একটা তার পাঠালে হয় না।

ক্ষেপেছো, খবর না দিয়ে যাবার একরকম জ্বালা, দিয়ে যাবার শতেক জ্বালা। চুপ করে থাকাই ভাল।

কিন্তু খবর না দিয়ে গেলে অনেক কৈফিয়ৎ দিতে হবে যে বড়বাবুর কাছে।

সলিল তার আঙুলের ডগাটা কপালে ছুঁইয়ে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেয়, সবই অদৃষ্ট।

বনবিহারী সমস্ত জিনিষপত্র গুছিয়ে নেয় কৈলির সাহায্যে। স্থির হয়, রাতের গাড়ীতেই তারা রওনা হবে।

সর্দার মাঝি তাদের এগিয়ে দিতে আসে। সঙ্গে আসে কৈলির মা ও হীরা। তাদের চোখের কোণে জলবিন্দু দেখা দেয়। মেয়েটা শহরে না জানি কত অসুবিধায় পড়বে, লাঞ্ছনা পাবে। আর তার সাথে দেখা হবে না। কৈলির মা কেঁদে ভেঙ্গে পড়ে।

বনবিহারী সর্দারকে সান্ত্বনা দেয়, ভেবো না সর্দার মাঝি, আমি আছি। কৈলি আমার মেয়ের মত

শুষ্ক খুসীর হাসি হাসে সর্দার।

কৈলিও যেন ভরসা পায় বুড়োর কথায়।

রওনা হয় কৈলি, সলিল আর বনবিহারী। সাঁওতালদের দল দূরে দাঁড়িয়ে দেখে তাদের বিদায় পর্ব। হীরা লাফ দিয়ে এসে জড়িয়ে ধরে দিদিকে।

তু না যাস দিদি।

কৈলির চোখে জল ভরে ওঠে। সর্দার নিরুপায় হয়ে বিদায় দেয় কৈলিকে। এ সমাজে তার ঠাঁই হবে না তাই। নইলে কিছুতেই সে তাকে অজানা দেশে পাঠাতো না।

কৈলির মা কৈলিকে জড়িয়ে ধরে।

তুকে হামি না ছোড়বে বিটি।

সাঁওতাল মাঝিরা তাকে বাধা দেয়। হাত ছাড়িয়ে নেয়। কৈলির পা যেন চলতে চায় না। সে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়, কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

সলিল ও কৈলিকে রওনা করে দিয়ে বনবিহারী নিজের বিছানাটা তুলে নেয় কাঁধে। তারপর শেষবারের মত দেখে নেয় সেই সর্বনাশা লালকুঠিকে। হঠাৎ সে তার কর্তব্য স্থির করে ফেলে। সে বিছানাটা কাঁধ থেকে ফেলে দিয়ে ঘরে ঢোকে।

ততক্ষণে সর্দার, কৈলি ও সলিল খানিকটা দূরে চলে গিয়েছে।

বনবিহারী পরিত্যক্ত কেরোসিনের বোতলটা তুলে নেয় তারপর দরজা ও জানালার উপর বেশ খানিকটা তেল ঢেলে দেয়। চারদিক দেখে নিয়ে দেশলাই কাঠি বার করে সে। কাঠির জ্বলন্ত অংশটুকু ছুঁইয়ে দেয়, কেরোসিন সিক্ত কাঠের উপর। কাঠির চুম্বনে জ্বলে ওঠে আগুন। সে ত্রস্তে দরজা ভেজিয়ে বেরিয়ে পড়ে। ক্ষিপ্রপদে এসে মিশে যায় তার দলে। মাঝে-মাঝে ঘাড় ফিরিয়ে সে তাকায় লালকুঠির দিকে।

ততক্ষণে লালকুঠির টালির ছাদের ফাঁকে-ফাঁকে আগুনের শিখা আত্মপ্রকাশ করছে। একটা আত্মতৃপ্তির ভাব ফুটে ওঠে বনবিহারীর চোখে-মুখে। শহরের বাবুদের অপকীর্তির ঠাঁইটুকুকে সে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। পকেট থেকে সে একটা বিড়ি বার করে ধরিয়ে সুখটান দেয়। লালকুঠির আগুন দিয়ে বিড়িটা ধরাতে পারলে তার মনটা যেন আরো খুসী হত।

জোরে পা চালায় বনবিহারী।

যার সলজ্জ ভাব ও চেহারাটা মনে-মনে সলিল গেল-কাল কল্পনা করেছিল, আজ ট্রেনে তাকে কাছে পেয়ে তার অস্বস্তির সীমা নেই। তার চোখে এখন কৈলি একটা লাল শাড়ীর পুটুলি বিশেষ। এর বেশী মূল্য তাকে দিতে তার মন আজ সায় দেয় না। কয়েকদিন আগে সে তাকে মনে-মনে অনেক মূল্য দিয়েছে, তার স্বাস্থ্য, চেহারা, লাবণ্য তাকে এত মুগ্ধ করেছিল সে ইলার সঙ্গে তাকে তুলনা করতে এতটুকু ইতস্ততঃ করেনি। শুধু তুলনা করেই সে ক্ষান্ত হয়নি, কৈলিকে সে প্রাধান্যও দিয়েছে। আর আজ গাড়ীর দ্রুত গতির সঙ্গে তার মনের বিরূপ ভাব যেন দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে। বিরাট কর্মক্ষেত্রে তার জংলী অশিক্ষিত স্ত্রী কী কাজে লাগবে, তা সে ভেবে পায় না। সে কোনদিন তাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিতে পারবে কিনা জানে না। এক একবার মন তার বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

না, না, এ বিয়ে সে স্বীকার করবে না, করতে পারে না। যে-বিয়ে তার সমাজ মানবে না, সে-বিয়েকে সে কীভাবে স্বীকার

করতে পারে ? অসম্ভব। নেহাৎ বিড়ম্বনার মধ্যে পড়ে তাকে এই রক্ত-মাংসের পুটুলিটাকে বাধ্য হয়ে নিয়ে আসতে হয়েছে। অবস্থা বিশেষে বাধ্য হয়ে কিছু করাকে স্বাভাবিক বলে স্বীকৃতি দেওয়া যায় না। যদি সে স্বেচ্ছায় কৈলিকে বিয়ে করে আনতো, তাহলে সে-সমাজের প্রশ্নেরও সমস্যার সম্মুখীন হতে দ্বিধা বোধ করতো না। এটুকু সৎ-সাহস তার আজও আছে সে বিশ্বাস করে।

যখনই পিতার আভিজাত্যপূর্ণ ও ইলার ব্যক্তিত্বপূর্ণ চেহারা মনে হয়, সে মুষড়ে পড়ে। সে তার অনিচ্ছাকৃত অপরাধের কৈফিয়ৎ খুঁজে পায় না। রাগটা গিয়ে পড়ে তার বনবিহারীর উপর। সে ক্রুর দৃষ্টিতে তাকায় তার দিকে। তার ধারণা বনবিহারী ইচ্ছা করলে হয়ত এই গুরু দায়িত্বটাকে এড়িয়ে আসতে পারতো।

বনবিহারী কৈলিকে নিয়ে পাশের গদি আঁটা বেঞ্চিটায় বসে আছে। দেখলে মনে হয়, বাপ যেন তার মেয়েকে আগলে রেখেছে।

কৈলি একবার তাকায় রাঙাবাবুর দিকে, তার স্বামীর দিকে। সে ভেবে পায় না হঠাৎ রাঙাবাবু এমন হয়ে গেল কেন ?

কখনও কখনও কৈলির নিরীহ ভাব ও সরল দৃষ্টিতে সলিলের মনে করুণার সঞ্চার হয়। সে মনে-মনে বিচার করে, কৈলির অপরাধটা কোথায় ! সে তার সমাজের অনুশাসন মেনেছে, মাথা পেতে নিয়েছে তাদের বিচার, এতটুকু প্রতিবাদ করেনি সে।

সলিলের বিবেক মাঝে-মাঝে তাকে কশাঘাত করে, চোখে আঙুল দিয়ে তার দোষটা দেখিয়ে দেয়। কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষী মন সে যেন কিছুতেই যুক্তি মানতে চায় না। এই বিজ্ঞানের যুগে সংস্কারের কোন মূল্য অথবা স্বীকৃতি দিতে চায় না।

ভাবতে-ভাবতে সলিলের মাথা ধরে যায়। সে যন্ত্রণা অনুভব করে।

সে নিজেই কুঁজো থেকে একগ্লাস জল গড়িয়ে নেয়। স্যুটকেশ খুলে ওষুধের একটা বড়ি মুখে পুরে। তারপর সে তার নির্দিষ্ট বার্থের উপর শুয়ে পড়ে।

কৈলি জীবনে এই প্রথম ট্রেনে ওঠে। জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখে। গাছ-পালা, বাড়ী-ঘর, ক্ষেত-খামার সব যেন পাল্লা দিয়ে ট্রেনটার সঙ্গে দৌড়ুচ্ছে। দেখতে বেশ লাগে।

ট্রেনের দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরাটাকে কৈলি ভাল করে লক্ষ্য করে। ঠিক ঘরের মত। প্রয়োজনীয় সব কিছুই আছে। গাড়ী প্রচণ্ড গতিতে চলছে কিন্তু ঘরটা ঠিক আছে, উল্টে যায় না, শুধু মাঝে-মাঝে কেঁপে ওঠে। যখন বেশী কেঁপে ওঠে তখন সে বনবিহারীর হাত চেপে ধরে। প্রতিটি ষ্টেশনে যাত্রীদের ওঠানামা দেখতে তার ভাল লাগে। কোথা থেকে কোথায় যায় তারা কে জানে!

সকালের দিকে হাত-মুখ ধুয়ে নিয়ে বনবিহারী তার নিজের বিছানাপত্রগুলো গোছ-গাছ করে নেয়। সলিলকে সে উদ্দেশ করে বলে, হাওড়া ষ্টেশন আসতে দেরী নেই. ওঠো বিছানা গুটাতে হবে। তারপর কৈলির দিকে ফিরে বলে, আর বেশী দেরী নেই বাড়ী পৌঁছুতে।

কৈলির কাছে বাড়ীর কথা প্রায় নিরর্থক। সে জানে না, কোথায় বাড়ী, কি রকম বাড়ী, ঘর। সে জানে, সে যাচ্ছে একটা অচিন দেশে, শহরে যেখানে রাঙাবাবু ও বুড়া ছাড়া তার কেউ আপনার লোক নেই। নানারকম আশঙ্কায় তার বুকের ভিতরটা দুরু-দুরু করে ওঠে। শহরের লোকদের সম্বন্ধে তার আগের ধারণাটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তারা তাদের কোন খাতির করে না, জানোয়ারের মত খাটায়, দুর্ব্যবহার করে। ময়না পাড়ার মাঝিদের

কারো কারো পিঠে এখনও ঠিকাদারদের চাবুকের দাগ আছে। তারা ভুলিয়ে লোভ দেখিয়ে নিয়ে যায় তাদের শহরে, তারপর সে আর ভাবতে পারে না।

কত করুণ কাহিনী তার মনের পটে ভেসে ওঠে। কত ভয়াবহ দৃশ্য সে দেখেছে। ঠিকাদারদের লোক একবার সুখন মাঝিকে ধরে নিয়ে যায় শহরে, ডেরাতে তার আগুন লাগিয়ে দেয়। সুখন মাঝির সে কি কান্না! লছমী ও তার মা পালিয়ে আসে তাদের বাড়ীতে। সর্দার দুজনকে লুকিয়ে রাখে একটা ভাঙ্গা পাতার ছাউনিতে, যেখানে ছাগল থাকে। তাছাড়া সে আরো অত্যাচারেব কাহিনী শুনেছে তার বাবা ও মার মুখে।

সাদার্ণ এভিনিউর শেষ মাথায় লেকের মুখোমুখি সগর্বে দাঁড়িয়ে রায়ভিলা'। এই 'রায়ভিলা' রায় পরিবারের আভিজাত্যের প্রতীক।

ডাঃ সুবিনয় রায় প্রায় তিন লাখ টাকা ব্যয় করে প্রতিষ্ঠা করেছেন এই 'রায়ভিলা'। এটা গড়তে গিয়ে তাঁর স্বোপার্জিত অর্থের অতিরিক্ত পৈতৃক সম্পত্তিতে হাত দিতে হয়েছে। এতে তাঁর আদৌ দুঃখ নেই। প্রাসাদোপম 'রায়ভিলা'র দিকে তাকিয়ে তিনি বিরাট অর্থব্যয়ের শোকটা ভুলে যান। তাঁর মতে আভিজাত্যই যদি না রইলো তবে মানুষের রইলো কি? এই আভিজাত্যের গৌরব তাঁর অস্থি-মজ্জার মধ্যে বর্তমান। তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেন, আভিজাত্য বজায় রাখতে তাঁর আচার ব্যবহার, চাল-চলনের মধ্যে। বালিগঞ্জের নতুন বড়লোকদের তিনি ভুঁইফোড় এরিষ্টোক্রেট বলে ব্যঙ্গ করেন। তাই কারো সঙ্গে বড় একটা মেশেন না। স্বীয় আভিজাত্যের গৌরবে তিনি নিজেই নিজেকে নিয়ে মশগুল।

সেদিন ইলা 'রায়ভিলা' পৌঁছে সরাসরি দোতলায় উঠে কলিংবেল টেপে। ডাঃ রায় দরজা খুলে বেরিয়ে আসেন। ইলাকে দেখে তিনি সোল্লাসে চেঁচিয়ে ওঠেন।

আরে ইলা যে, এস এস।

তারপর অভিমানের সুরে অনুযোগ করেন। এতদিনে বুঝি বুড়ো ছেলেকে মনে পড়লো?

ইলা তার না আসার কৈফিয়ৎ দেয়।

রোজই ভাবি একবার আসবো, কিন্তু পরীক্ষার পড়ার জন্যে আর আসা হয় না। মা কিন্তু প্রায়ই তাগিদ দেন।

মিসেস ঘোষ সে-কেলে মহিলা। কাজেই তাঁর দয়ামায়া বিবেচনা আছে। তোমাদের আমলে এ জিনিষটার বড্ড অভাব। বলতে-বলতে ডাঃ রায় ইলাকে নিয়ে এসে রঙিন রেলিঙঘেরা খোলা বারান্দায় বসেন।

সকাল-বিকেল এখানটায় এসে বসি। দক্ষিণের হাওয়ায় শরীরটা জুড়িয়ে যায়।

ইলাও 'রায়ভিলার' প্রশংসা করে।

কাকাবাবু, আপনার 'রায়ভিলা' সত্যিই অতুলনীয়। এতল্লাটে এমন স্নুন্দর বাড়ী আর দুটি নেই।

খুশী হন ডাঃ রায়। বলেন, তোমার চোখ আছে মা! সলিল বলে, এটা নিছক অপব্যয়ের নামান্তর মাত্র। আমি কিন্তু তা স্বীকার করিনে। আভিজাত্য বজায় রাখতে হলে এর প্রয়োজন আছে, স্বার্থকতা আছে।

একটু জিরিয়ে আবার সুরু করেন, তাই সলিলকে বলি, মিশবে সম্ভ্রান্ত লোকের সঙ্গে, দৃষ্টিভঙ্গি ভাল হবে, মনটাও বড় হবে। নীচতা, হীনতা মনে ঘেঁষতে পারবে না। বড়র বড় গুণ। সত্যি কিনা বল?

খুবই সত্যিকথা কাকাবাবু।

ইলার সমর্থন পেয়ে ডাঃ রায়ের মুখে একটা গর্বের ও তৃপ্তির ভাব ফুটে ওঠে।

আমার আশঙ্কা হয় মা। সলিল 'রায়ভিলা'র আভিজাত্য অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবে কিনা। কারণ, সে বড় হুজুগে। নিজের প্রতি আদৌ সচেতন নয়, তরতম জ্ঞান নেই, আপন ভোলা। একটা চাপা নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে তাঁর মুখ থেকে।

ইলা তাঁকে সান্ত্বনা দেয়।

কিচ্ছু ভাববেন না কাকাবাবু। সলিল কখনও পারিবারিক

সম্মান ও আভিজাত্যের অবমাননা করতে পারে না।

তোমার কথাই যেন সত্যি হয় মা। তারপর কি একটু ভেবে নিয়ে তিনি আবার বলেন, আজ একটা কথা বলবো মা! আশা করি জবাব দিতে তুমি সঙ্কোচ বোধ করবে না। লেখাপড়া শিখেছো, তুদিন বাদে ডাক্তার হয়ে বেরুবে। সঙ্কোচ করলেই বা চলবে কেন? তা ছাড়া তোমার স্পষ্ট মত না নিয়ে আমি এগুতে পারিনে।

ইলা ইঙ্গিতটা বুঝেও না বোঝার ভাণ করে।

ডাঃ রায় শেষে সোজাসুজি তাঁর মনের কথাটা ব্যক্ত করেন। তোমাব হাতে 'রায়ভিলা' ও সলিলের সমস্ত ভার তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারি মা। আমি জানি সলিলের এতে অমত হবে না। এখন তোমার মতটা জানলেই...

ইলাব সম্মতিব আশায় তিনি সাগ্রহে তাকান। কথা কয়টা বলতে বলতে তিনি হাঁপিযে ওঠেন।

ইলা ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

কাকাবাবু আপনি এখন বিশ্রাম করুন। নইলে রক্তের চাপ আবার বেড়ে যাবে।

ডাঃ রায়কে ধরে এনে সে বিছানায় শুইয়ে দেয়।

তোমাদের বাধা নিষেধেই তো আমার ব্যামোটা বেড়ে যায় মা! ব্যামোকে আস্কারা দিতে নেই।

বিয়ের প্রসঙ্গটা আপনি চাপা পড়ে যায়। ইলা নিশ্চিন্ত হয়। আর একটু পেড়াপিড়ি করলে সে হয়ত কথা দিয়েই দিত। কোন অজুহাতে সে পালাতে পারলেই বাঁচে।

ডাঃ রায় একটু সুস্থ হতেই সে বলে, পড়াশোনা আছে, এখন উঠি কাকাবাবু।

আমার কথার উত্তর দিয়ে গেলে না তো?

আমাকে এ সংসারে জড়িয়ে লাভ হবে না। কারণ আমি স্থির করেছি, ডাক্তারি পাশ করে সমাজ সেবার ভার নেবো। গরীব দুঃখীদের বিনা পয়সায় চিকিৎসা করবো।

উষ্মার সহিত ডাঃ রায় বলেন, জানিনে, এসব বুজরুকি তোমার মাথায় কে ঢুকিয়েছে, ওসব পাগলামো ছাড়ো মা। বলতে-বলতে তিনি উত্তেজিত হয়ে উঠেন। উত্তেজনায় তাঁর রক্তের চাপ আবার বেড়ে যায়।

খানিকক্ষণ পরে তিনি নিজেই সান্ত্বনা দেন ইলাকে। কিচ্ছু ভেবো না মা, ওরকম হয মাঝে-মাঝে। তিনি আরো কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ একটা ট্যাক্সি থামার কর্কশ আওয়াজে তাঁর বক্তব্যটা বাধা পায়।

তিনি উঠে বারান্দায় যেতে চেষ্টা করেন।

আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমি দেখছি কে এসেছে।

রেলিঙের উপর দিয়ে গলা বাড়িয়ে পথের দিকে তাকাতেই ইলার চোখে পড়ে বনবিহারী ট্যাক্সি থেকে নেমে আসছে। সে ডাঃ রায়কে উদ্দেশ্য করে বলে, কাকাবাবু, সলিল ও বনবিহারী এসেছে।

বনবিহারী ট্যাক্সির দরজা খুলে দিতেই সলিল ও কৈলি নেমে আসে।

কৈলিকে ট্যাক্সি থেকে নামতে দেখে ইলার যেন বাক্‌শক্তি হারিয়ে যায়। কৈলির আসার হেতুটা সে খুঁজে পায় না।

ডাঃ রায় চেঁচিয়ে বলেন, সলিল যেন উপরে যাবার আগে এখানে একবার আসে। বলেই তিনি নিজে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যান।

হঠাৎ বনবিহারীর পশ্চাতে কৈলিকে আসতে দেখে ডাঃ রায় প্রথমটা আশ্চর্য হয়ে যান। তারা সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় আসতেই

তিনি বনবিহারীকে জিজ্ঞেস করেন, এটি কে ?

এক্ষুনি আসছি বড়বাবু, বলে বনবিহারী প্রশ্নের উত্তরটা এড়িয়ে যায়। কৈলিকে সে তেতলাব সিঁড়ি দেখিয়ে দেয়।

ডাঃ রায় মনে করেন, বনবিহারী হয়ত বাড়ীর কাজের জন্যে একটা সাঁওতাল মেয়ে নিয়ে এসেছে।

ইলাকে উদ্দেশ করে বলেন, জানলে ইলা, বিহারীটার চারদিকে বেশ খেয়াল আছে। এখানে কাজের অসুবিধা দেখে সে একটা সাঁওতাল মেয়েকে নিয়ে এসেছে।

ইলা তাঁর কথায় সায় না দিয়ে বজ্রাহতের মত নিঃশব্দে একঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। মনটা তার সন্দেহে দোলা দিয়ে ওঠে। কৈলির সিঁথির সিঁদুর প্রমাণ করে দেয়, তার আশঙ্কাটা অমূলক নয়।

বনবিহাবী কৈলিকে তেতলায় সলিলের ঘরে পেঁীছে দিয়েই ফিবে আসে ডাঃ রায়ের কাছে। তাকে দেখেই তিনি জিজ্ঞাসা করেন, হঠাৎ কোন খবর না দিয়েই চলে এলে যে ?

একটা ঢোক গিলে নিয়ে বনবিহারী নিজেকে সামলে নেয়।

বলছি বড়বাবু।

ইলা বিষয়ের গুরুত্ব আঁচ করে নিয়ে ডাঃ রায়ের নিকট আবার বিদায় চায়।

কাকাবাবু আমি এখন আসি, অনেক বেলা হয়ে গেছে।

আরেকটু বসো মা। এদ্দিন বাদে সলিল এলো।

সে এখন বিশ্রাম করুক, পরে দেখা হবে।

এক প্রকার জোর করেই ইলা উঠে পড়ে। তারপর সে নিঃশব্দে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

বনবিহারীর যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে। সে এতক্ষণ ইলার সামনে হাঁপিয়ে উঠেছিল।

ডাঃ রায় আবার প্রশ্ন করেন, মেয়েটি কে?

বনবিহারী অপরাধীর মত কম্পিত কণ্ঠে সব কাহিনীটা সংক্ষেপে বলে যায়। শেষে সে জানায়, কৈলিকে নিয়ে আসা ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না। সাঁওতালের দল ক্ষেপে উঠেছিল। বনবিহারীর কথা শেষ হওয়ার পূর্বেই ডাঃ রায়ের রক্তের চাপ বেড়ে যায়। তিনি অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন। বনবিহারী উঠে গিয়ে ঘরের পাখাটার গতি বাড়িয়ে দেয়। উপরে গিয়ে সলিলকে খবর দেয়, এবং নিজে ছুটে যায় ডাক্তার ডাকতে।

বেশী দূর তাকে যেতে হয় না। কয়েকটা বাড়ীর পরেই ডাঃ সোমের বাড়ী। ডাঃ সোম বনবিহারীর মুখে ডা রায়ের অসুস্থতার খবর পেয়েই 'রায়ভিলায়' আসেন। তিনি ডাঃ রায়কে ভাল করে পরীক্ষা করে সলিলকে জানান, রক্তের চাপ বেশ বেড়েছে। ওষুধ লিখে দিয়ে তিনি উঠে পড়েন। বনবিহারী নীরবে তাঁর ব্যাগটা মোটরে তুলে দিয়ে ফিরে আসে।

ওষুধ খাওয়ার পর ডাঃ রায়ের অস্থিরতা কমে আসে। তিনি মাঝে-মাঝে চোখ খুলে তাকান। সলিলকে দেখেই আবার তক্ষুনি চোখ বন্ধ করেন। একটা ঘৃণার ভাব ফুটে ওঠে তাঁর নাকের ডগায়।

বনবিহারী হাতের কাজ সেরে এসে আবার মেঝের উপর বসে পড়ে।

সলিল ঘর থেকে বাইরে যেতেই ডাঃ রায় আবার চোখ খোলেন। বনবিহারীকে সাবধান করে দেন, ও পাষণ্ডটা যেন আমার কাছে না আসে, বারণ করে দিয়ো। ও বংশের কুলাঙ্গার।

বনবিহারীকেও তিনি নিষ্কৃতি দেন না।

তুমিও তো ছিলে তার ভার নিয়ে। আমি ভেবেছিলাম

তোমার দায়িত্ববোধ আছে। তাই নিশ্চিন্ত হয়ে ছেড়ে দিয়েছিলাম তোমার উপর। এতদিনে বুঝলাম, চাকর—চাকরই।

এই কঠোর মন্তব্যে বনবিহারীর চোখের কোণে জল দেখা দেয়। সে ধুতির খুঁট দিয়ে চোখ মোছে।

বড়বাবু, আপনি সেরে উঠে আমাকে যে সাজা দেবেন, তাই মাথা পেতে নেব। এখন আর কথা বলবেন না, শরীর খারাপ হবে।

ডাঃ রায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন।

আমার শরীর খারাপের চিন্তায় তোমার ঘুম হয় না, রাস্কেল কোথাকার! তোমরা দুটোতে মিলে আমার মান-সম্মান সব ডোবালে, রায় পবিবারের আভিজাত্য নষ্ট করলে। বলেই তিনি রাগে কাঁপতে থাকেন।

বনবিহারী স্বগত বলে, আমি এখন কি করি! দিদিমণি থাকলে সব দিক সামলাতে পারত।

তার উক্তিটা কানে যেতেই ডাঃ রায় উত্তেজিত হয়ে ওঠেন।

দিদিমণির কথা তখন মনে ছিল না, যখন একটা জংলী বুনোকে তার আসনে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়েছিলে? এখন দিদিমণিকে ডাকবে কোন মুখে! আর সেই বা আসবে কেন?

ইলার বাড়ী ফিরতে প্রায় বেলা বারোটা বাজে। মৃণ্ময়ী দেবী তার জন্যে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। ইলাকে আসতে দেখেই তিনি প্রায় ছুটে এসে তার বিলম্বের কারণ জিজ্ঞেস করেন।

ইলা সংক্ষেপে জবাব দেয়, কাকাবাবু অসুস্থ। বলেই সে নিজের ঘরের দিকে চলে যায়।

মৃণ্ময়ী দেবী মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করেন, তার চেহারাটা যেন হঠাৎ বিবর্ণ হয়ে গেছে। তিনি তার পিছু-পিছু আসেন।

উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করেন, তোর শরীর খারাপ হয় নি তো?

ইলার তরফ থেকে কোন উত্তর আসে না। সে তার ক্লান্ত দেহটাকে বিছানার উপর এলিয়ে দেয়। শুয়ে-শুয়ে সে ভাবে এ কী হল? সলিল যে এমনি একটা অভাবিত কাণ্ড করে বসবে, তা সে কল্পনাও করতে পারেনি। বিগত দিনের কথা তার মনে পড়ে। সে প্রথমে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল, নিজেকে বন্ধু-বান্ধবের সমালোচনার খোরাক করে তুলবে না, কারো সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশবে না। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাসে সলিল এসে দেখা দেয় তার জীবনে। আদর্শ যুবক, চরিত্রবান বলে সুনাম আছে তার। অন্যান্য মেডিকেল ছাত্রদের ঈর্ষার বস্তু সে। সে তাকে বন্ধু হিসাবে পেয়ে মনে-মনে খুসী হয়। বন্ধুত্ব ক্রমে প্রেমে পরিণত হয়। সেই প্রেমের জোরে সে চেয়েছিল সলিলকে ধরে রাখতে। তাকে নিয়ে নতুন ব্রত উদযাপন করতে, গরীব দুঃখীদের বিনা-পয়সায় চিকিৎসা করতে, এমন সময় কোত্থেকে একটা জংলী অশিক্ষিতা নারী এসে তার উপর টেক্কা মেরে দিল। তার স্বপ্ন, সাধনা সব চুরমার করে দিয়ে গেল। ভাবতে-ভাবতে ইলার মাথার ভিতরটা যেন বয়লারের মত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ জাতটার উপর তার মনটা বিষিয়ে ওঠে। ডাঃ সেন, অলক আর সলিলের মধ্যে চরিত্রের যে বিরাট ব্যবধান ছিল, তা যেন একাকার হয়ে গেল।

মৃণ্ময়ী নিশ্চিত ধরে নিয়েছেন যে ডাঃ রায়ের অসুখের বাড়াবাড়ি হয়েছে। তিনি স্থির করেন, নিজে গিয়ে একবার দেখে আসবেন তাঁকে। তিনি এ পরিবারের একজন শুভাকাঙ্ক্ষী। তাঁর বিপদে চুপ করে থাকা উচিত নয়।

বিকেলের দিকে সন্তু ঝিকে নিয়ে মৃণ্ময়ী দেবী বেরিয়ে পড়েন 'রায়ভিলা'র উদ্দেশ্যে। ইলা তাঁকে বারণ করে না। কারণ মার যাওয়াটা সে মন্দের ভাল বলেই ধরে নেয়। মা নিজের চোখেই ব্যাপারটা দেখে আসুক। তাহলে সে নিজে অসংখ্য প্রশ্ন থেকে রেহাই পাবে। এটাই তার পরম লাভ।

মৃণ্ময়ী দেবী যখন 'রায়ভিলায়' পৌঁছুলেন, তখন বিকেল পাঁচটা। বনবিহারী চা ও জলখাবারের তদারক করছে। সলিল চায়ের প্রত্যাশায় বসে আছে। কৈলি বনবিহারীর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে কাজকর্মগুলি লক্ষ্য করছে।

বেবী ট্যাক্সির হর্ণ কানে যেতেই বনবিহারী সদরের দিকে ছুটে যায়।

মৃণ্ময়ী তাকে জিজ্ঞেস করেন, সব ভাল তো? সুবিনয়বাবু, সলিল, তোমরা সব?

ভাল। নির্লিপ্তভাবে জবাব দেয় বনবিহারী।

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন মৃণ্ময়ী দেবী। তিনি দোতালায় উঠে আসেন।

ডাঃ রায় তখন ঘরের মধ্যে একটা ইজিচেয়ারে অর্ধশায়িত অবস্থায় বিশ্রাম করছেন। হঠাৎ মৃণ্ময়ীকে ঘরে ঢুকতে দেখে তিনি সোজা হয়ে বসেন।

মিসেস ঘোষ যে, হঠাৎ কী মনে করে? মৃণ্ময়ী একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসেন।

এখন কেমন আছেন?

আমি এখন ভাল-মন্দ থাকার বাইরে। যেতে পারলেই বাঁচি। বলতে বলতে ডাঃ রায় নৈরাশ্যে ভেঙে পড়েন। মৃণ্ময়ী লক্ষ্য করেন, ডাঃ রায়ের চেহারাটা বেশ ভেঙে পড়েছে। রক্তের

চাপের রোগী, কিছু বলা যায় না, কখন কী হয়। খানিকক্ষণ কি একটু ভেবে নিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য পেশ করেন।

অনেকদিন থেকেই একটা কথা বলব-বলব ভাবছি, কিন্তু বলা আর হয়ে ওঠে না।

বলুন।

বলছিলাম কি, ইলার ডাক্তারি পরীক্ষার পরই তার বিয়েটা দেব। ভাবছি আপনার যদি অমত না হয়, তাহলে সলিলের সঙ্গে তার বিয়ের কথাটা পাকা করে রাখি। পরে দিনক্ষণ স্থির করা যাবে।

ডাঃ রায়ের মুখ থেকে খানিকটা রক্ত যেন হঠাৎ সরে যায়। তিনি একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলেন।

আপনি পাকা করতে চাইলেই তো আর পাকা হবে না মিসেস ঘোষ, ওদিকে ঈশ্বর সব কাঁচিয়ে রেখেছেন।

কথাটার তাৎপর্য বুঝতে না পেরে মৃণ্ময়ী দেবী ডাঃ রায়ের দিকে তাকান।

তিনি জোর দিয়ে আবার বলেন, আমি ঠিকই বলছি মিসেস ঘোষ। আজ সকালে ইলা যখন এলো, আমি সরাসরি তার মত জানতে চেয়েছিলাম।

ইলা বুঝি অমত করল ?

না।

একটা ঢোক গিলে নিয়ে ডাঃ রায় আবার বলতে থাকেন।

আজ সকালে হঠাৎ দেখি সলিল আর বিহারী এসে হাজির। সঙ্গে একটা সাঁওতাল মেয়ে, মনে করলাম বনবিহারী বুঝি বুদ্ধি করে বাড়ীর কাজের জন্য একটা কুলিমেয়ে নিয়ে এসেছে। তাকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করতেই সে জানায়, ঐ জংলী মেয়েটাই ছোটবাবুর বৌ।

কথা কয়টা শেষ করেই তিনি ক্লান্ত বোধ করেন। মুখে ঘামের বিন্দু ফুটে ওঠে। মৃণ্ময়ী দেবীও যেন তাঁর বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেলেন। তিনি পাথরের মূর্তির মত স্তব্ধ হয়ে খানিকক্ষণ বসে থাকেন। তার আশা আকাঙ্ক্ষা ধূলিস্যাৎ হয়ে যায় নিমেষের মধ্যে।

বনবিহারী খাবার নিয়ে আসতেই তিনি তাকে উদ্দেশ করে বলেন, ওসব থাক, আমাকে একটা গাড়ী ডেকে দাও।

সলিল তেতলার বারান্দা থেকে দাঁড়িয়ে দেখে মৃণ্ময়ী বেরিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর ব্যক্তিত্বপূর্ণ সুন্দর মাতৃমূর্তিটা যেন অনেকটা নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। এসেই হঠাৎ চলে যাওয়ার কারণটা তার নিকট অস্পষ্ট থাকে না।

এমনই পিতার, ইলার ও মৃণ্ময়ী দেবীর বিষাদপূর্ণ চেহারা তার মনের পটে ভেসে ওঠে, সে মুষড়ে পড়ে। তার মনে হয়, তিন জোড়া চোখ যেন একসঙ্গে তার কাছে কৈফিয়ৎ চায়, ব্যঙ্গ করে। যে কৈলিকে দেখে ময়না পাড়ায় মুগ্ধ হয়েছিল সে, আজ সেই কৈলিই যেন তার চোখের বিষফোড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। সলিলের মনটা অনুশোচনায় ভরে ওঠে। তার কেবলই মনে হয়, সে কাঞ্চন ফেলে কাঁচ তুলে নিয়েছে। তার অনিচ্ছাকৃত অপরাধের মাশুল এমনি করে দিতে হবে সে কল্পনাও করতে পারেনি।

বনের হরিণীকে খাঁচায় এনে পুরলে যে অবস্থা হয়, কৈলির ঠিক তাই হয়েছে। তার মুক্ত জীবন রুদ্ধ ঘরের মধ্যে বন্দী। তার নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসে। হাঁপিয়ে ওঠে সে। মাঝে-মাঝে তাকিয়ে দেখে সে রাঙাবাবুর দিকে। তার মিষ্টি হাসিটুকু, মিষ্টি স্বভাব, সবই যেন হারিয়ে গেছে। সে বুঝে উঠতে পারে না, এমন কেন হল ? থেকে থেকে বনবিহারীর আশ্বাস বাণী তার মনে

পড়ে। কিছু ভাবিসনে বেটী, আমি তো আছি তোর বুড়ো ছেলে। সব ঠিক হয়ে যাবে দুদিন বাদে। শুধু কদিন মুখ বুজে সহ্য করে থাক।

বনবিহারী যেমন কৈলিকে মা বলে ডাকে তেমনি তাকে মার মর্যাদাও দেয়। সে নিজের হাতে রুটি ও ভাত পরিবেশন করে তাকে। নিজেই তার এঁটো পরিষ্কার করে। অন্য ঝি-চাকরদের সে তার কাছে ভিড়তে দেয় না ইচ্ছে করেই। পাছে তার খুঁত বার করে অনভিজ্ঞতা ও সরলস্বভাবের সুযোগ নিয়ে পরোক্ষে ব্যঙ্গ করে, অবহেলা করে।

কৈলির প্রতি সলিলের উদাসীন ভাব দেখে বনবিহারী মনে কষ্ট পায়। সে অনুমতি নিয়ে অবসর সময়ে কৈলিকে বাংলার উচ্চারণ ও লেখা শেখায়। সে অবাক হয়ে যায় তার অনুকরণ ও স্মরণশক্তি দেখে। কৈলি খুব উৎসাহের সঙ্গে শেখে। সে আপ্রাণ চেষ্টা করে নিজেকে রায়পরিবারের উপযোগী করে তুলতে। শহরের পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলতে।

মৃণ্ময়ী দেবী বাড়ী ফিরেই নিজের ঘরের দরজায় খিল দিয়ে শুয়ে পড়েন। সন্তুকে বারণ করে দেন, কেউ যেন তাকে বিরক্ত না করে। শরীরটা তাঁর ভাল নেই।

সন্তুকে নীচে নেমে আসতে দেখেই ইলা তাকে প্রশ্ন করে, মা আসেননি?

এয়েছেন, ঘরে শুয়ে আছেন। তেনার শরীরটা ভাল নেই। তাই ডাকতে বারণ করেছেন।

ইলা জানতো যে 'রায়ভিলা' থেকে মা ফিরে এসেই নৈরাশ্যে ভেঙে পড়বেন। তাই সে সন্তুর মুখে এ সংবাদ শুনে এতটুকু আশ্চর্য হয়নি।

মৃণ্ময়ী শুয়ে শুয়ে ভাবেন, এ কী হল ? তার সব পরিকল্পনা পণ্ড হয়ে গেল। এতদিন তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন, যে ইলার বিয়ে সলিলের সঙ্গেই হবে। আজ এই বিয়ের কথাটা পাড়তে গিয়ে তিনি শুধু গ্লানি বয়ে নিয়ে এসেছেন। ইলা যদি আগে ইঙ্গিতে এতটুকু জানাতো যে সলিল ময়নাপাড়া থেকে বিয়ে করে ফিরেছে, তাহলে তাকে আজ এত ছোট হতে হত না ! দুঃখে ও অনুশোচনায় তিনি অন্তরে দগ্ধ হতে থাকেন।

রাত্রি আটটার সময় ইলা একপ্রকার জোর করেই মাকে বিছানা থেকে উঠিয়ে আনে। খাবার জন্যে পেড়াপিড়ি করে। মৃণ্ময়ী বিরক্ত হয়ে ওঠেন, তিরস্কার করেন।

তুই ইচ্ছে করেই আমাকে অপমান করলি। সলিলের বিয়ের কথাটা যদি আগে বলতিস, তাহলে আজ আমাকে অতখানি ছোট হতে হত না।

মার কথা শুনে ইলা প্রথমটা হতভম্ব হয়ে যায়।

এতে তোমার ছোট হওয়ার কী আছে ?

আজ আমি তোর বিয়ের প্রস্তাবটা পেড়েছিলাম ডাঃ রায়ের কাছে।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে ইলা আর্তকণ্ঠে বলে, এ কী তুমি করলে মা ?

তারপর নিজেকে কোন রকমে সামলে নেয় সে। মাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করে।

অত মুষড়ে পড়ার কী আছে মা ? সলিল ছাড়া কি আর ভাল পাত্র এ সংসারে নেই ?

মৃণ্ময়ী মনে-মনে জানেন, সলিল ছাড়া ইলার মনোমত পাত্র আর কেউ নেই। তবুও তিনি তার মুখে এ অপ্রত্যাশিত কথা শুনে কতকটা আশ্বস্ত হন।

উক্তিটা ইলার নিজের কানেই যেন কেমন বিশ্রী লাগে।

হঠাৎ যেন সে একটা কঠিন রায় দিয়ে ফেলে। তারপর সে প্রায় ছুটে চলে যায় তার শোওয়ার ঘরে। নিজের উক্তিটা সে মনে-মনে যাচাই করে দেখে। কথার গুরুত্বটা চিন্তা করে সে আঁতকে ওঠে। মনে-মনে বলে, অসম্ভব, অসম্ভব। অন্য কাউকেই সে তার মনে ঠাঁই দিতে পারে না। সলিলের প্রভাব, স্পর্শ তার দেহে ও মনে সর্বতোভাবে জড়িয়ে আছে।

মৃণ্ময়ী দেবী ইলার ভাবান্তর লক্ষ্য করেন। যতটা সহজে সে তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করছে, ঠিক ততটা সহজভাবে সে বিষয়টাকে নিতে পারেনি। অন্তরে ক্ষত-বিক্ষত হয়েও যে বাইরে সহজ ভাবটা ফুটিয়ে তুলতে ইলা আপ্রাণ চেষ্টা করছে, তা তাঁর কাছে গোপন থাকে না। মেয়ের চেহারা দেখে মার বুঝতে বাকি থাকে না আঘাতটা কতখানি লেগেছে!

সহানুভূতিতে ও স্নেহে মৃণ্ময়ীর মনটা ভরে ওঠে। মুহূর্তের মধ্যে তিনি সব অভিমান ভুলে যান। তার মনে হয় তিনি যেন তাকে লঘু অপরাধে গুরু দণ্ড দিয়েছেন। এর জন্যে সে তো দায়ী নয়। যে দায়ী তাকে তিনি একটি কথাও শোনাননি। মুখ বুজে চলে এসেছেন। শেষে রাগটা তাঁর নিজের উপরই হয়। তিনি ইলাকে ডেকে বলেন, আমার আজ শরীরটা ভাল নেই। বামুন ঠাকরুণকে বলে দে, আমি রাত্রে কিছুই খাবনা।

আব্দারের সুরে ইলা বলে, না তোমাকে খেতেই হবে। আমি নিজের হাতে সব তৈরী করে দেব।

মৃণ্ময়ী বুঝলেন, মেয়ে তাকে চাঙা করে তুলতে চায়, তাই তিনি হেসে ফেলেন। বলেন, আচ্ছা খাবো'খন।

ইলা নিজেই ময়দা মেখে লুচি ভাজে, হিটারে দুধ গরম করে। কথায়-কথায় অনেকগুলো ফল কেটে ফেলে সে।

হঠাৎ মৃণ্ময়ীর ফলের ডিসটার উপর নজর পড়ে। ও কী করেছিস!

অত ফল খাবে কে ? তাছাড়া আমি অতগুলো লুচি খাব না।

ইলা নিজের ভুলটা শোধরাবার চেষ্টা করে।

বারে, আজ যে আমি তোমার সঙ্গে বসে খাব। তাইতো সব কিছু একটু বেশী-বেশী করেছি।

মেয়ের উপস্থিত বুদ্ধি দেখে তিনি না হেসে থাকতে পারেন না। সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকান মেয়ের দিকে।

মন্তব্য করেন, উপস্থিত বুদ্ধিটা তোর বাপের কাছ থেকে পেয়েছিস।

আর কিছু পাইনি ?

পেয়েছিস বৈকি ? তাঁর ব্যক্তিত্ব ও সহ্যক্ষমতা।

ইলা ইচ্ছা করেই প্রসঙ্গটার মোড় ঘুরিয়ে দেয়।

মা, আর দু টুকরো ফল দিই।

মৃণ্ময়ী তাকে বারণ করেন। যুক্তি দেখান, বয়স হলে খাওয়া কমাতে হয়, তুই তো জানিস মা!

ডাঃ রায় যখন ভাল থাকেন, তখন বনবিহারীকে ডাকেন। আজ তিনি একটু ভাল বোধ করছেন। তাই বনবিহারীকে ডেকে পাঠালেন। সে আসতেই তিনি বলেন, একটা বিশেষ কথা আছে বিহারী।

বনবিহারী মেঝের উপর নিঃশব্দে বসে পড়ে। বিশেষ কথার তাৎপর্যটা বুঝতে তার বিলম্ব হয় না। সে জানে বিশেষ কথা মানে সেই একই কথা। 'বিহারী কাজটা ভাল হল না।' এ কথা শুনে-শুনে তার বিরক্ত ধরে গেছে। আজও তার অনুমান মিথ্যা হয় না।

ডাঃ রায় সখেদে বলেন, সমাজে এখন আমি মুখ দেখাব কী

করে? যে ছেলের সুখ্যাতি কদিন আগেও করেছি সেই ছেলেই আমার মুখে চুণ কালি ঢেলে দিলে। বলতে-বলতে অনুশোচনায় তিনি ভেঙে পড়েন।

বনবিহারী তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা খুঁজে পায় না। তার মন যুক্তি খুঁজে ফিরে। সে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে তার ব্যক্তিগত জীবনের জের টেনে বলতে সুরু করে।

বড়বাবু, মনে পড়ে আজ থেকে ত্রিশ বছর আগেকার কথা। আমি যখন কালিম্পঙ থেকে কাপুরুষের মত পালিয়েছিলাম। আপনি আমায় কী বলেছিলেন? বলেছিলেন, বিহারী তুই জানোয়ারের মত কাজ করেছিস। নিরপরাধী কাঞ্চীর মৃত্যুর জন্য তুই দায়ী। ভগবান তোকে ক্ষমা করবেন না। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই। একনিঃশ্বাসে বনবিহারী কথাগুলো বলে ফেলে। তারপর একটা ঢোক গিলে নিয়ে আবার বলে, আমি চাকর, মূর্খ, অসহায় বলেই বুঝি আমাকে এ উপদেশ দিয়েছিলেন।

ডাঃ রায়ের পিঠে যেন চাবুকের ঘা পড়ে। একটা অব্যক্ত বেদনার ছাপ তাঁর মুখে ফুটে ওঠে। তিনি কাতরকণ্ঠে বলেন, সুযোগ পেয়ে তাই বুঝি তুমি আমার উপর প্রতিশোধ নিলে বিহারী।

আমায় ভুল বুঝবেন না বড়বাবু। আমি সাঁওতালদের মোটা টাকার লোভ দেখিয়েছি, অন্য যে কোন রকম খেসারতি দিতে স্বীকার করেছি। কিন্তু তারা রাজী হয়নি। তারা জেদ ধরে, মেয়েটাকে বিয়ে করে নিয়ে যেতে হবে। ভয় দেখায়, নইলে ছোটবাবুকে কেটে টুকরো টুকরো করে ঝিলের জলে ছুঁড়ে ফেলে দেবে।

শুনতে শুনতে ডাঃ রায় কেঁপে ওঠেন। চেঁচিয়ে ধমক দেন, থামো, বিহারী থামো।

ডাঃ রায়ের ধমকে বনবিহারীর কথাগুলোর খেই হারিয়ে যায়। একটু জিরিয়ে নিয়ে তিনি আবার তাকে ভর্ৎসনা করেন। তুমি কি চোখ কান বুজে ছিলে? তোমার আস্কারা না পেলে জংলী মেয়েটা সলিলের কাছে ভিড়তে কখনও সাহস পেতনা। দোলের দিন তুমি কোথায় ছিলে?

কম্পিতকণ্ঠে বনবিহারী কৈফিয়ৎ দেয়, শহরে গিয়েছিলাম, মন্দিরে পূজো দিতে। বিকেলে এসেই দেখি, সাঁওতালের দল বাড়ীটা ঘিরে ফেলেছে।

হঠাৎ কলিংবেল বেজে ওঠায় বনবিহারীর কথা মধ্যপথে থেমে যায়। সঙ্গে-সঙ্গে শক্ত সমর্থ একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক প্রবেশ করেন।

ডা৹ রায় মুখ তুলে তাকান। দেখেন, তাঁর বাল্যবন্ধু অমর মুখার্জী। তিনি সোৎসাহে উঠে তাঁকে সম্ভাষণ জানান। এস হে মুখার্জী এস।

মিঃ মুখার্জী বনবিহারীর মুখের দিকে তাকান। বলেন, একে যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে।

কয়েক সেকেণ্ড স্মরণশক্তিটাকে ঝালিয়ে নিয়ে তিনি বলেন, ওঃ মনে পড়েছে, সেই কালিম্পঙের হিরো।

হিরো শব্দটার অর্থ না জানলেও বনবিহারীর শ্লেষটা বুঝতে বিলম্ব হয়নি। সে আস্তে-আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। বনবিহারী বেরিয়ে যেতেই মিঃ মুখার্জী প্রশ্ন করেন, এখন বলো কেমন আছো?

আর আছি। কোন রকমে বাকী কটা দিন কাটানো।

মিসেস মারা যাবার পর থেকেই তুমি যেন কেমন হয়ে গেছো।

ডাঃ রায় প্রসঙ্গটার মোড় ঘুরিয়ে দেন। জিজ্ঞেস করেন, তারপর হঠাৎ এখানে কি মনে করে?

এখানে পুলিশ-সুপার হয়ে বদলী হয়ে এসেছি।

এখানে মানে ?

আলিপুরে। তোমাদের বৃহত্তর কোলকাতার মধ্যেই

বেশ-বেশ, তাহলে এ বেলার আহারটা এখানেই হোক।

আজ নয়, আরেক দিন।

অমর মুখার্জীর দীর্ঘ সমর্থ চেহারা দেখলে মনে হয় তিনি ডাঃ রায়ের চাইতে বয়সে অনেক ছোট। কিন্তু তা নয়। তারা দুজন প্রায় সমবয়সী। ডাঃ রায় রক্তের চাপের দরুণ নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁরা দুজনে একই শহরে বহুদিন সরকারী কাজে বহাল ছিলেন। সেই সূত্রে তাঁদের সৌহার্দ আজও বজায় রয়েছে। পরস্পর পরস্পরের সুখ-দুঃখের কথা তাঁরা দেখা হলেই আলাপ করেন। ব্যক্তিগত বা সাংসারিক জীবনে কোন সমস্যা দেখা দিলে তাঁরা এক সঙ্গে বসে সমস্যা সমাধানের উপায় স্থির করেন।

মুখার্জী যেমন চট করে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন, ডাঃ রায় তা পারেন না। কাজেই তাঁকে মুখার্জীর পরামর্শের উপরেই অনেক সময় নির্ভর করতে হত। আজ তাঁকে কাছে পেয়ে ডাঃ রায় ভাবলেন, তাঁর নতুন সমস্যার কথাটা তাঁকে জানিয়ে একটা পরামর্শ চাইবেন।

বনবিহারী ডিস ভর্তি খাবার ও একগ্লাস জল নিয়ে আসে। ডিসের উপর বড়-বড় কড়াপাকের সন্দেশ দেখে মুখার্জী বলে ওঠেন, বনবিহারী দেখছি আজও মনে রেখেছে আমার কড়াপাকের উপর লোভের কথা।

বনবিহারী বলে, বাবু আমার মনে আছে, কোলকাতা থেকে

কড়াপাকের সন্দেশ পেলে আপনি কত খুশী হতেন।

পুলিশের ধাত কড়া, তাই কড়াপাক ছাড়া অন্য কিছু মুখে রোচে না। বলেই তিনি সশব্দে হেসে ওঠেন।

বনবিহারী ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই ডাঃ রায় লাল বাতির সুইচ টেপেন, সঙ্গে-সঙ্গে বাইরে লালবাতি জ্বলে ওঠে।

নির্জন কথাবার্তা বা নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রামের প্রয়োজন হলে তিনি লালবাতির সুইচ টেপেন, বাইরের লোকের প্রবেশ নিষেধের ইঙ্গিত।

ডাঃ রায় অমর মুখার্জীর দিকে তাকিয়ে বলেন, মুখার্জী এসময়ে তোমাকে আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

কোন পুলিশ কেস আছে নাকি ?

পুলিশ কেস নেই তবে একটা ফুলিশ কেস আছে।

ডাঃ রায় আস্তে-আস্তে সলিলের চেঞ্জে যাওয়া, কৈলিকে বিয়ে করে নিয়ে আসা ইস্তক আনুপূর্বিক সব ঘটনা বর্ণনা করলেন।

সবটুকু শুনে নিয়ে মিঃ মুখার্জী বললেন, অত ভেঙে পড়ার কী আছে ? যা হবার হয়ে গেছে।

এখন সমাজে মুখ দেখাই কি করে ?

মেয়েটার তো কোন দোষ নেই। তোমার ছেলে নিজে দায়ী। কাজেই তোমাকে এ ব্যাপারটা সামলে নিতে হবে। ঢাক ঢোল পিটিয়ে ছুঁচোর কীর্তন করে কি লাভ হবে ? তার চাইতে ঘষে-মেজে মেয়েটাকে যাতে সংসারে প্রতিষ্ঠা করা যায়, সেই চেষ্টা করো।

শত চেষ্টা করলেও জংলীকে সভ্য করা যায় না, সভ্য সমাজে ঠাঁই দেওয়া যায় না, অসম্ভব।

ডাঃ রায়ের কথায় মুখার্জী উত্তেজিত হয়ে ওঠেন।

কোন কোন ভদ্র সভ্য শহুরেদের এসভ্যতা জংলীদের অসভ্যতাকে হার মানায়, তা জানো ?

ডাঃ রায় তীব্র প্রতিবাদ জানান, কী যা' তা' বলছ অমর ?

মিঃ মুখার্জী পুনরায় উত্তেজিত হয়ে ওঠেন।

ঠিক কথাই বলছি সুবিনয়। জংলীদের অন্তরের এবং বাইরের আচরণ একই রকম। আধুনিক শিক্ষিত ভদ্র সমাজের লোকদের আচরণ ও কাজের মধ্যে এতটুকু সঙ্গতি নেই। মনে এক মুখে আর। নিজেদের স্বার্থ মেটাতে গিয়ে সময়-সময় তারা এমন জঘন্য কাজ করে, যা' দেখে জংলীরা পর্যন্ত লজ্জা পায়। আমি নিজে পুলিশের লোক। ভদ্র সমাজের গোপন কাজের ও পাপের তালিকা আমার জানা আছে। কাজেই এই সমাজের উপর আমার শ্রদ্ধা দিনকে দিন কমেই আসছে। পাহাড়ী, জংলী এরা যে ভদ্রলোকদের চাইতে অনেক বেশী বিশ্বাসযোগ্য এবং সৎ এবিষয়ে আমার আদৌ সন্দেহ নেই।

মিঃ মুখার্জিকে নিরস্ত করার জন্যে ডাঃ রায় বলেন, এবিষয়ে বাকযুদ্ধ করে লাভ নেই অমর। এখন আমাকে একটা পথ বলে দাও।

আমি তো একটা পথেরই সন্ধান জানি। মেয়েটাকে বৌ-এর মর্যাদা দিয়ে ঘরে তুলে নেওয়া। তার চাইতে সহজ সুন্দর পথ আমার জানা নেই। তারপর সলিলকে দায়িত্ব বইবার জন্য সাহস দেওয়া, আর তোমাকে সমাজাতঙ্ক রোগ ও আভিজাত্যের বাতিক থেকে মুক্ত করা আমার কর্তব্য।

বলা যত সহজ, করাটা ঠিক তত নয়। তা'ছাড়া সমস্যাটা তোমার নয়, আমার। তাই বিষয়টাকে হাল্কাভাবে নিতে পেরেছো, উপহাস করে উড়িয়ে দিচ্ছো। বলেই নৈরাশ্যে ভেঙে পড়েন ডাঃ রায়।

ডাঃ রায়ের এ অভিযোগে মিঃ মুখার্জী ক্ষুণ্ণ হন। তিনি বলেন, সুবিনয়, তোমার ছেলে ও আমার ছেলের মধ্যে আমি কোন পার্থক্য দেখিনে।

আঘাতটাকে সামলে নিয়ে তিনি আবার বলেন, আচ্ছা, মেয়েটিকে একটু দেখতে পারি ?

প্রথমটা ডাঃ রায় একটু ইতস্তত করেন। তারপর তিনি লাল বাতির সুইচ বন্ধ করে দিয়ে কলিঙবেল টেপেন। সঙ্গে-সঙ্গে বনবিহারী এসে হাজির হয়।

ডাঃ রায় তাকে বলেন, মেয়েটিকে নিয়ে এস, মুখার্জী সাহেব দেখতে চাইছেন।

মেয়েটি কে বনবিহারীর তা বুঝতে বিলম্ব হয় না। সে উপরে এসে কৈলিকে বলে, বড়বাবু ডাকছেন।

কৈলি খুসী হয়ে ওঠে। চট করে ভাল একটা রঙীন সিল্কের শাড়ীর ভাঁজ ভেঙে নেয়। মেয়েরা কি ঢঙে শাড়ী পরে, তা দেখে দেখে খালি ঘরে একা-একা মহড়া দিয়েছে সে। এ কদিনের মধ্যেই সে নিখুঁতভাবে শাড়ী পরতে শিখে ফেলেছে।

খানিকক্ষণ পর বনবিহারী ফিরে এসে দেখে কৈলি শাড়ী পরে তৈরি হয়ে রয়েছে।

সে কৈলিকে নিয়ে ডাঃ রায়ের ঘরে প্রবেশ করা মাত্রই তিনি মুখ ঘুরিয়ে রইলেন অন্যদিকে।

মিঃ মুখার্জী কৈলিকে দেখে সোল্লাসে তারিফ করেন, বাঃ বেশ চমৎকার মেয়ে। এমন সতেজ সুন্দর চোখ-মুখ বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না।

কৈলি আসা অবধি ডাঃ রায় একবারও তাকে কাছে ডাকেননি; ভাল করে দেখেননি। ভেবেছিলেন, আর দশটা জংলী সাঁওতাল মেয়ে যেরকম হয়, এও তাই হবে। এতটুকু ব্যতিক্রম তিনি আশা করেননি।

কৈলি বাঙালী মেয়ের কায়দায় ডাঃ রায় ও মুখার্জীর পায়ে প্রণাম করে। অজ্ঞাতসারে ডাঃ রায়ের হাতখানা যেন তার মাথা স্পর্শ করে। তিনি কৈলির দিকে তাকিয়ে সত্যিই অবাক হয়ে যান।

মুখার্জী এতটুকু বাড়িয়ে বলেননি।

বনবিহারী ভগবানের নিকট মনে-মনে প্রার্থনা জানায়, বড়বাবুর ভাঙা মনটা যেন জোড়া লাগে ঠাকুর। কৈলিকে যেন তিনি পুত্রবধূর মর্যাদা দেন, স্নেহ করেন।

মুখার্জী কৈলির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেন, তোমার নাম কি মা ?

বনানী রায়। স্পষ্ট উচ্চারণ করে কৈলি। এতটুকু জড়তা নেই তার কণ্ঠে। বলা বাহুল্য সলিলের দেওয়া নামটা সে রপ্ত করেছে বহুবার মহড়া দিয়ে।

শহর কেমন লাগছে ?

ভাল, সুন্দর।

খানিকক্ষণ পর ডাঃ রায়ের নির্দেশ মত বনবিহারী কৈলিকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। যাওয়ার সময় কৈলি আর একবার যথারীতি পা-ছুঁয়ে প্রণাম করে দুজনকে।

কৈলি ও বনবিহারী চলে যেতেই মিঃ মুখার্জী ডাঃ রায়কে বলেন, আমি নিশ্চিত বলতে পারি, বনানীকে ভাল করে শিখিয়ে পড়িয়ে নিলে সে কিছুদিনের মধ্যেই শহুরে মেয়েদের উপর টেক্কা দিয়ে চলতে পারবে।

কথাগুলো ডাঃ রায়ের কানে গেল কিনা ঠিক বোঝা গেল না। তিনি একমনে যেন কি ভাবছিলেন। তাঁর জট পাকানো দুশ্চিন্তাগুলো যেন কেমন আলগা হয়ে যেতে থাকে। কিছুতেই চিন্তাগুলোকে আর তিনি মনে গুছিয়ে আনতে পারেন না আগের মত।

তাঁকে অন্যমনস্ক দেখে মিঃ মুখার্জী জিজ্ঞেস করেন, কি হে, অত ভাবছো কি ?

ভাবছি বিচিত্র মানুষের মন।

ডাঃ রায় মুখার্জীকে আর আমল দিতে চান না।

বন্ধুর মনের ভাবটা বুঝতে মুখার্জীরও বিলম্ব হয় না। তিনি বোঝেন, অনর্থক যুক্তিতর্ক দেখিয়ে লাভ হবে না। তাই সেদিনকার মত বিদায় নিয়ে তিনি উঠে পড়েন। সিঁড়ি ভেঙে একতলায় আসতেই সলিলের সাথে তাঁর দেখা হয়। সলিল তখন বাইরে থেকে সবে ফিরছে।

কে সলিল নাকি? প্রশ্ন করেন মিঃ মুখার্জী।

সলিল টিপ করে একটা প্রণাম করে। তাকে আশীর্বাদ জানিয়ে মিঃ মুখার্জী জিজ্ঞেস করেন, কেমন আছো?

মাথা নেড়ে সলিল জানায় সে ভাল আছে। তার আশঙ্কা হচ্ছিল এক্ষুনি বুঝি অমর কাকু তার হঠকারিতার জন্যে তিরস্কার করবেন।

মিঃ মুখার্জী কিন্তু সে ধার দিয়েও গেলেন না। উল্টে সলিলের পিঠটা চাপড়ে দিয়ে বললেন, আমি সব শুনেছি, তুমি কিচ্ছু অন্যায় করোনি বাবা। বি ষ্টেডি, বলেই তিনি বেরিয়ে যান।

সলিল ধীরে-ধীরে যেন তার লুপ্ত মনের বল ফিরে পায়। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সে সিঁড়ি ভেঙে উপরে আসে। অত সহজে যে নিষ্কৃতি পাবে তা সে ভাবতেই পারেনি।

বনবিহারী তখন তেতলার বারান্দা পরিষ্কার করতে ব্যস্ত। সলিলকে দেখেই সে ছুটে এসে সুখবরটা দেয়, ছোটবাবু আজ কেল্লা ফতে।

ব্যাপারটা কি খুলেই বল না।

বড়বাবু আর মুখার্জী সাহেব আজ আমার মাকে দেখে খুসী হয়েছেন, আশীর্বাদ করেছেন।

সত্যি নাকি ?

অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে সলিল তাকায় বনবিহারীর দিকে।

বনবিহারী খুসী মনে নীচে চলে যায়।

সলিল কৈলির কাছে এসে দাঁড়ায়।

বাঃ আজ তো ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে। কে সাজিয়ে দিয়েছে?

কৈলি জানায়, সে নিজেই সেজেছে। সগর্বে তাকায় স্বামীর মুখের দিকে।

সলিলের মনটা চাঙা হয়ে ওঠে। তার মনের চাকা ঘুরে যায়। সে কৈলিকে বুকের উপর টেনে নিয়ে চিবুকের উপর একটি চুম্বন এঁকে দেয়। আনন্দে কৈলির মনটা ভরে ওঠে। বহুদিন পর স্বামীর মুখে হাসি দেখে সে খুসী হয়। সে যেন তার হারানো জীবনের সুরটুকু ফিরে পায়।

বনবিহারী আনন্দে আজ দুঘণ্টার কাজ একঘণ্টায় সেরে ফেলে।

মানদা ঝি বলে, বুড়োর মনে রঙ ধরেছে দেখছি।

রঙ কি তোদের একচেটিয়া ? বনবিহারী ঝাঁঝাল কণ্ঠে জবাব দেয়।

তোমার রঙ হবে না তো কার হবে ? বাবুদের পেয়ারের লোক। তার উপর...

বনবিহারী ধমকে ওঠে, যা'তা বলিসনে মানদা, ঝেঁটিয়ে মুখ ভেঙে দেবো।

মানদা গজগজ করতে-করতে নিজের কাজে চলে যায়।

সলিলকেও আজ গুনগুন করে গানের সুর ভাঁজতে দেখা যায়। কৈলিরও মনের মেঘ অনেকটা কেটে যায়। তার বিশ্বাস, বনবিহারীর কথাই হয়ত সত্যি হবে। ক'দিন বাদে সব ঠিক হয়ে যাবে। আশার আলোক সে দেখতে পায়।

অলকের সঙ্গে সলিলের ঝগড়া হয়েছিল, ইলাকে কেন্দ্র করে। সেই থেকে অলক সুযোগ খুঁজছে ইলা ও সলিলকে জব্দ করার।

দুঃসংবাদ বেশীদিন চাপা থাকে না। এর কান তার কান করে সংবাদটা পৌঁছে অলকের কানে। সে ভাবে কন্‌গ্রেচুলেশনের নাম করে সলিলকে বিদ্রূপ করে আসার এই অপূর্ব সুযোগ। তাই সেদিন বিকেলে সে অযাচিতভাবে হাজির হয় 'রায়ভিলা'তে। তাকে দেখে সলিল অবাক হয়ে যায়।

প্রশ্ন করে, হঠাৎ কী মনে করে?

শুনলাম বিয়ে করেছো, আশা করেছিলাম অন্তত নেমন্তন্নটা পাবো, কিন্তু...

বিদ্রূপটা তীব্রভাবে আঘাত করে সলিলকে। কিন্তু সে মুষড়ে পড়ে না। নীরবে হজম করে নেয়।

উত্তর দেয়, বিয়েটা হঠাৎ হল, তাও কোলকাতার বাইরে। তাই এখানকার কাউকে খবর দেওয়া সম্ভবপর হয়নি।

অলক ভেবেছিল সলিল অন্যরকম কৈফিয়ৎ দেবে। সে যে এমন স্পষ্ট এবং এত সহজভাবে জবাব দেবে তা সে ভাবতেই পারেনি। সলিল তাকে নিয়ে এসে ড্রইং রুমে বসে।

অন্য কোথাও হলে সলিল অলকের খোঁচা বরদাস্ত করত না। কিন্তু সে যখন তার বাড়ীতে এসেছে, তখন তাকে অপমান করা ভদ্রতা বিরুদ্ধ। এই ভেবে সে রাগটা চেপে যায়।

সে চেঁচিয়ে বনবিহারীকে চা দিতে বলে।

বনবিহারী চা ও খাবার নিয়ে ড্রইং রুমে আসে। তাকে চা-খাবার নিয়ে আসতে দেখেই অলকের চা খাওয়ার উৎসাহ কমে যায়।

সে প্রশ্ন করে, মিসেস কোথায়? ভেবেছিলাম তার সাথে একসঙ্গে বসে চা খাব, পরিচয় হবে

সলিল একবার ভাবে, সে কৈলির শরীর খারাপের অজুহাতে

তাকে এড়িয়ে যাবে। কিন্তু অলককে সে জানে। সে যদি আজ কৈলিকে না দেখে ফিরে যায়, তাহলে রঙ চড়িয়ে যা' তা হয়ত বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে বলে বেড়াবে। তার চাইতে একদিনেই লেটা চুকিয়ে দেওয়া ভাল।

এই ভেবে সে বনবিহারীকে বলে, বনানীকে একবার আসতে বল।

মিনিট পাঁচেক পরে কৈলি আসে। সে ঘরে ঢুকতেই অলক ভদ্রতার খাতিরে উঠে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে নমস্কার জানায়। তার ধারণা ছিল, সলিলের জংলী বৌটা নিশ্চয়ই সামাজিক ভদ্রতা ইত্যাদি জানে না। কৈলি নিখুঁতভাবে প্রতিনমস্কার জানাতেই সে সত্যিই অবাক হয়ে যায়। অধিকন্তু তার চেহারার গড়ন ও দেহের কান্তি দেখে সে নির্লজ্জের মত হাঁ করে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে। শহরের শিক্ষিত ভদ্রলোকের নির্লজ্জ দৃষ্টির কাছে জংলী মেয়েও লজ্জা পায়।

কৈলি তার মাথা নীচু করে রাখে।

অলক স্বগত বলে, এ ওয়াণ্ডার ফুল কালেকশন্ ইনডিড।

পরে সলিলের দিকে তাকিয়ে তার রুচির প্রশংসা করে।

তোমার টেষ্ট আছে বটে।

মুখে প্রশংসা করলেও মনে-মনে সে খুসী হয় না। কারণ তার উদ্দেশ্য সফল হয়নি। কৈলির এমন কিছু খুঁত খুঁজে সে পায়নি যা বন্ধু-বান্ধব মহলে সরসে পরিবেশন করা যায়। কি একটু ভেবে নিয়ে সে সলিলের দিকে তাকিয়ে প্রস্তাব করে, চল একটু লেক থেকে ঘুরে আসা যাক।

প্রথমে সলিল অনিচ্ছা প্রকাশ করে। অলকের বিশেষ অনুরোধে শেষপর্যন্ত তাকে রাজী হতে হয় এবং কৈলিকেও নিতে হয় সঙ্গে।

তিনজন একই সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে। সলিলের আশঙ্কা কৈলি না জানি কখন কি নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়ে ফেলে। অলকের টীকা টিপ্পনীর শিকার হয়ে পড়ে।

খাঁচার পাখী হঠাৎ মুক্তি পেলে তার যেমন আনন্দ হয়, কৈলির ঠিক তাই হল। লেকের পাড়ে এসে তার ইচ্ছা হল একটা লম্বা ছুট দিতে। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে বনবিহারীর উপদেশটা তার মনে পড়ে। বৌ মানুষের দৌড়-ঝাঁপ করতে নেই, শহরে নিন্দে হয়। তাই জোর করে সে তার মনের রাশ টেনে ধরে। জঙ্গলের উঁচু-নীচু রাস্তাগুলি তার ডিঙিয়ে চলতে খুব ভাল লাগতো। সমতল জায়গায় হেঁটে বেড়িয়ে তার সুখ হয় না।

সলিল আর কৈলি আগে-আগে চলে, অলক পড়ে থাকে পেছনে। মুচকি হেসে ফেলে কৌলি। পরাজয়ের জ্বালা ধরে অলকের মনে। সে প্রায় দৌড়ে চলে।

হাঁপাতে-হাঁপাতে এসে কৈফিয়ৎ দেয় সে, সম্প্রতি অসুখ থেকে উঠেছে তাই ডাক্তারের বারণ জোরে হাঁটা।

সলিল তার যুক্তি শুনে মুখ টিপে হাসে।

খানিকক্ষণ হাঁটার পর তিনজন এসে বসে একটা বেঞ্চে।

অলক কেনে কুলপি বরফ আর চিনে বাদাম।

সলিল নিষেধ করে, এসব খাওয়া উচিত নয়। দিনকাল বড্ড খারাপ।

অলক তার যুক্তি মানে না। সে তিন ঠোঙা বাদাম ও তিনটে কুলপি বরফ কেনে। কুলপি খেয়ে কৈলি খুসীতে যেন মেতে ওঠে। কী মজা! তারপর সানন্দে বাদাম ভেঙে খায়। সে যেন তার হারানো দিনগুলি ফিরে পায়।

অলক জানে, জংলী বা পহাড়ীর মুখে নরম সন্দেশের চাইতে কড়া বাদাম ভাল লাগবে। সে নিজে বাদাম খেলেও চিনে বাদাম খায় না, খায় পেস্তা বাদাম। আজ কৈলির সঙ্গে সৌহার্দ্য বাড়াবার জন্যেই সে সস্তার চিনে-বাদাম ও কুলপি বরফ কেনে।

যখনই কৈলি খুসী হয়ে ওঠে, তার শিশুর মত সরল-সুন্দর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে; হাসির ফোয়ারা ছোটে। কাঁধ থেকে শাড়ীর আঁচল খসে পড়ে হাসির বেগের সঙ্গে-সঙ্গে।

অলক মুগ্ধ হয়ে দেখে তার শরীরের নিটোল গড়নটা।

সেদিনকার মত বেড়ানো শেষ করে তিনজনেই ফেরে বাড়ীর দিকে।

অলক পথ চলতে-চলতে কৈলিকে উদ্দেশ্য করে বলে, আজকের দিনটা আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। সত্যিই বেশ আনন্দে কাটলো। তারপর কৈলিকে জিজ্ঞেস করে, আপনার কেমন লাগল বনানী দেবী।

খুব ভাল।

সলিল ও কৈলির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অলক একটা ভাড়াটে ট্যাক্সি ডেকে উঠে পড়ে। চলন্ত গাড়ীর দরজার বাইরে হাত বাড়িয়ে বলে, টা-টা।

সলিলও ভদ্রতার খাতিরে হাত উঁচিয়ে জানায়, টা-টা।

সশব্দে ছুটে যায় গাড়ীটা। কৈলি লক্ষ্য করে তার গতি। গাড়ীটার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটতে পারলে তার মনটা যেন খুসী হত।

বাড়ী ফিরতেই বনবিহারী কৈলিকে জিজ্ঞেস করে, লেক কেমন লাগল মা?

খু-উ-ব ভাল বলেই কৈলি সানন্দে বর্ণনা করে তাদের বাদাম ও কুলপি খাওয়ার ব্যাপারটা। প্রথমটা কুলপি বরফের নাম ও বর্ণনা সে সঠিক বলতে পারে না। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সলিলের দিকে তাকাতেই সে বলে দেয়, ওটাকে কুলপি বরফ বলে।

কৈলি সঙ্গে-সঙ্গে আব্দার জানায়, আর একদিন ওটা আনতে হবে। সলিল কথা দেয়। কৈলি খুসী হয়ে চলে যায় তার ঘরে। বনবিহারী একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। ঠাকুর বোধ হয় এতদিনে তার প্রার্থনা শুনেছেন।

ডাঃ রায়ের থেকে-থেকে মনে পড়ে অমর মুখার্জীর উপদেশ। কিন্তু তাঁর উপদেশের কোন যুক্তিই তিনি খুঁজে পান না। একটা বুনো অশিক্ষিত অমার্জিত মেয়েকে তিনি রায় পরিবারের বৌ-এর মর্যাদা কিছুতেই দিতে পারেন না। অসম্ভব। তাঁর মনে হয় পুলিশের কাজ করে করে অমর মুখার্জীর সামাজিক মর্যাদা বোধ একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। দৃষ্টি-ভঙ্গি বদলে গেছে।

সলিলের ইচ্ছে হয় ফিরে পেতে তার বিয়ের আগের দিনগুলি। সে চায় তার হারানো সামাজিক জীবনটা ফিরে পেতে। বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে আগের মত মেলামেশা করে জীবনের স্বাচ্ছন্দের ভাব ফিরিয়ে আনতে।

ইদানীং কৈলি সলিলের প্রেমের স্পর্শ পেয়ে যেন সজীব হয়ে ওঠে। তার সাধ আকাঙ্ক্ষা ধীরে-ধীরে রূপ পায়। নিত্য নতুন জিনিষের মধ্যে সে নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে চায়। নতুনের নেশায় সে মেতে ওঠে। রকমারী সুন্দর জিনিষগুলি তার চোখে বিস্ময়

হয়ে ধরা দেয়। ধীরে-ধীরে তার জংলী জীবনের স্মৃতি অতীতের গর্ভে মিলিয়ে যায়। হারিয়ে যায়, ময়নাপাড়া।

সেদিন সান্ধ্য ভ্রমণের পর অলক সোজা চলে আসে ইলাদের বাড়ী। উদ্দেশ্য, সলিলকে নিয়ে ব্যঙ্গ করা, আর নিজের ঝাল মিটিয়ে নেওয়া। সে সটান উঠে আসে দোতলায়। মৃণ্ময়ী তাকে দেখে অবাক হয়ে যান।

এতদিন পর হঠাৎ কি মনে করে?

অলক সহাস্যে এগিয়ে গিয়ে তাঁর পায়েব ধূলো নেয়।

আপনার আশীর্বাদে পাশ করেছি। তাই প্রণাম জানাতে এসেছি।

বেশ, বেশ! তা এখন চাকুরী নেবে না প্র্যাকটিশ করবে? কি ঠিক করলে?

আপাতত চাকুরী বা প্র্যাকটিশ কিছুই করার ইচ্ছে নেই। চট করে একটা মিথ্যে কথা সে জুড়ে দেয়। বিলেত থেকে ফিরে যা হয় একটা কিছু করবো।

অলকের মুখে বিলেত যাওয়ার কথা শুনে মৃণ্ময়ীর মনের চাকা ঘুরে যায়। একটা চাপা স্বার্থ যেন চাড়া দিয়ে ওঠে তার মনে।

খানিকক্ষণ পর সন্তু চা ও খাবার নিয়ে আসে। অলকের অভিমানে আঘাত লাগে। ইলা খবর পেয়েও তার সঙ্গে দেখা করতে আসেনি। মনে-মনে সে রাগে ফুলতে থাকে।

প্রকাশ্যে সে মৃণ্ময়ীকে বলে, আপনি ব্যস্ত হবেন না মাসীমা, আমি নিজে গিয়ে তার সাথে দেখা করবো। সুখবরটা আমারই দেওয়া উচিত।

চা খাওয়া শেষ করেই অলক ইলার ষ্টাডি রুমের দিকে এগিয়ে যায়। ঘরের দরজা খোলাই ছিল।

ভেতরে আসতে পারি কি?

ভদ্রতার খাতিরে অনুমতি চায় অলক। কিন্তু কার্যতঃ অনুমতির অপেক্ষা না করেই সে দরজার পর্দা ঠেলে ঘরে ঢুকে পড়ে।

অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে ইলা তাকায় তার মুখের দিকে।

অলক বিষয়টাকে হাল্কা করতে চেষ্টা করে।

পরীক্ষা পাশের খবরটা দিতে এসেছি।

কন্‌গ্রেচুলেশন। বলেই ইলা হস্তস্থিত বই-এর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

তোমার ষ্টাডি রুমটা তো বেশ সুন্দর। দক্ষিণ খোলা....।

ইলা নিরুত্তর থাকে। অলক উপায় খোঁজে কেমন করে সলিলের প্রসঙ্গটা তোলা যায়।

হঠাৎ সে স্বগত বলে, সলিল যে এমন একটা জঘন্য কার্জ করবে, তা ভাবতে পারিনি। একে রীতিমত প্রতারণা বলে। সিম্‌প্লি ডিসিভিং।

ইলার চোখ দুটো যেন জ্বলে ওঠে। তার দিকে চোখ পড়তেই অলকের মন্তব্যটা অসমাপ্ত থেকে যায়।

ইলা অলকের দিকে তাকিয়ে ভৎ‍র্সনার সুরে বলে, আমি ভেবে পাইনে মানুষ কী করে এতখানি বেহায়া নির্লজ্জ হতে পারে।

অলক তার কথার জের টেনে নিয়ে বলে, সত্যি আমারও তাই মনে হয় সলিল যে অতটা নির্লজ্জ...

ইলা সরোষে অলকের দিকে তাকিয়ে মানেটা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেয়।

সলিলের কথা বলছিনে, তোমার কথাই বলছি।

মুহূর্তের মধ্যে যেন অলকের চেহারাটা বিবর্ণ হয়ে যায়। সে কোন রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, আমি জানি, হঠাৎ রেগে গেলে বা আঘাত পেলে কারো কারো মাথা ঠিক

থাকে না। আমার মনে হয় আজ তোমার মানসিক অবস্থা ভাল নয়।

বিদ্রূপের হাসি হাসে ইলা। তারপর ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকায় তার দিকে।

তোমার মত এমন নির্লজ্জ, বেহায়া পৃথিবীতে বোধ হয় আর দুটি নেই।

ইলার বিদ্রূপকে হেসে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করে অলক।

লজ্জা নারীর ভূষণ, পুরুষের ওতে কোন লোভ নেই।

উত্তেজিত হয়ে ওঠে ইলা। অলক হঠাৎ দাঁড়িয়ে ফেল্ট হ্যাটটা তেরছা করে মাথায় চড়িয়ে দরজার দিকে পা বাড়ায়। কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এসে সে সাহেবী কায়দায় বলে, টাইম ইজ দি বেষ্ট হিলার মিস ঘোষ।

তারপর টা-টা জানিয়ে সে বেরিয়ে পড়ে।

বলাবাহুল্য ইলার তরফ থেকে বিদায় সম্ভাষণটা আর ঘুরে আসে না।

শিস্ দিতে-দিতে অলক রাস্তায় নামে। সে এমনি ভাব দেখায় যেন কিছুই ঘটেনি।

ইলার কিছুতেই আর পড়ায় মন বসে না। সে সোজা তার মার ঘরে চলে আসে। মাকে উদ্দেশ্য করে বলে, তুমি যদি আর কখনও অলককে এমনভাবে আস্কারা দাও তাহলে আমি বাড়ী থেকে তাকে রীতিমত অপমান করে বার করে দেবো। বলে সে রাগে কাঁপতে থাকে।

মৃণ্ময়ী প্রথমটা হতভম্ব হয়ে যান, পরে বলেন, সে কি অন্যায় করেছে বল? ভদ্রলোকের শিক্ষিত ছেলে। তার উপর তোর

সহপাঠি বন্ধু। একটা সুখবর দিতে এসেছে।

ও আমার সহপাঠী নয়, বন্ধু নয়। পরম শত্রু। তুমি না মুখ দেখলেই লোক চেনো বলে গর্ব করো।

কই অলককে দেখলে তো তেমন খারাপ লোক বলে মনে হয় না।

ইলা হেসে বলে, আসলে তুমি লোকই চেনো না। তার মত অত বড় পাষণ্ড কপট লোক আমি তো আব কখনও দেখিনি। সে এসেছিল আমাকে সলিলের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে, মজা দেখতে। আর তোমার সম্পত্তির পরিমাণটা যাচাই করতে। তার বদ মতলব জানতে আমাব বাকি নেই।

অলক সে রাত্রে বাড়ী ফিরে খাওয়া-দাওয়া সেরে অনেকক্ষণ বারান্দায় পাইচারি করে। সে ইচ্ছে করেই, মনে-মনে ঝালিয়ে নিতে চেষ্টা করে ইলার অপমানজনক কথাগুলো। নিজেকে সচেতন রাখার জন্যে, প্রতিহিংসা নেবার জন্যে। স্থির করে ইলার দম্ভ সে চূর্ণ কববেই। একটা মেয়েকে শায়েস্তা করতে বেশী বেগ পেতে হবে না। বিশেষ করে ইলা এখন আব সলিলের সাহায্য পাবে না।

পরদিন অলক যায় সীমাদের বাড়ী। সে জানে সীমার ঝোঁক ছিল সলিলের দিকে। তাই ইলা এসে সলিলের সঙ্গে মেশার পর থেকে সে নিরাশ হয়ে সরে পড়ে। কিন্তু ইলার প্রতি তার ঈর্ষাটা এতটুকু কমেনি। সীমা, অলক ও সলিল সহপাঠী। অলকও মনে-মনে সীমাকে সহ্য করতে পা্র না। কিন্তু আজ তার গরজ বড় বেশী। তাই সে উপযাচক হয়ে যায় সীমার কাছে।

সীমা বাইরে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিল। অলকের আসার

খবর পেয়ে সে নীচে আসে।

কী মনে করে?

ভেরী ইণ্টারেষ্টিং নিউজ। ·খুব শ্রুতিরোচক সংবাদ।

ইজ ইট?

ও ইয়েস।

সীমা অলককে ড্রইং রুমে বসিয়ে ঠাকুরকে চা তৈরি করতে বলে।

অলক বারণ কবে। এখন আর চা খাবো না।

সীমা বেরিয়ে পড়ে অলকেব সাথে। খানিকটা পথ এসে অলক প্রস্তাব করে, চলো একটু কোথাও বসা যাক। অনেক কথা আছে।

সীমা হেসে বলে, আমি জানি তোমার পেটে কথা জমলেই বন্ধু-বান্ধবীর কথা মনে পড়ে। এবং নিজেব পয়সা খরচ করে এসে খবর পরিবেশন করা এটা তোমার স্পেশালিটি।

ঠিক তাই।

দুজনে একটা কফি হাউসে ঢোকে। একটা কেবিন তারা বেছে নেয়।

বয়কে অর্ডার দিয়ে অলক পবিবেশন করে সুখবরটা। মনোযোগ দিয়ে শোনে সীমা। আর মাঝে-মাঝে হেসে সে ভেঙে পড়ে। তার হাসিতে যোগ দেয় অলক। কেবিনটা সরগরম হয়ে ওঠে। মাঝে-মাঝে সীমা দ্বিধা বোধ করে অলকের কথাগুলি বিশ্বাস করতে। তবু শুনতে তার ভাল লাগে সলিলের দুর্ভাগ্যের কথা, হঠকারিতার কাহিনীটা। অলক আরো জানায়, সেদিন সে গিয়েছিল ইলাদের বাড়ী। ইলাকে যেন চেনা যায় না। সে একেবারে বদলে গেছে। সীমা এতে খুসীই হয়। প্রতিদ্বন্দ্বীর পরাজয় তার মনের জ্বালা কমিয়ে দেয়।

সে অলককে খোসামোদ করে, হাউ ফাইন ইউ আর।

অলক সীমাকে অনেক আশা-ভরসা দেয়। তার সহযোগিতা কামনা করে।

সেদিন সীমা আসে 'রায়ভিলায়' অপ্রত্যাশিতভাবে। সলিল তাকে যথারীতি সম্বর্ধনা জানায়। সীমার হঠাৎ আসার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য সলিলের অজানা নেই। তবুও মুখে সে বিরক্তি প্রকাশ করে না।

সীমা জিজ্ঞেস করে, কেমন আছ সলিল ?

খুব ভাল।

শত চেষ্টা করেও সীমা যখন কোন অসন্তোষের চিহ্ন খুঁজে পায় না সলিলেব মধ্যে, তখন সে নিরাশ হয়ে পড়ে। মনে-মনে অলককে অভিসম্পাত কবে। সে যা বলেছে সব মিথ্যে, নিছক বানানো।

সীমা তার আসাব কারণ জানায়।

এদিকে যাচ্ছিলাম, মনে হল একবার দেখা করে যাই, আর তোমার রেজাল্টটাও জেনে যাই।

সলিল হেসে বলে, রেজাল্টটা তো গেজেটেই দেখেছ।

তা জেনেছি। তবু কন্‌গ্রেচুলেশন জানাবার অধিকারটুকু আছে আশা করি।

নিশ্চয়ই। সলিল হেসে ফেলে।

সীমা চেষ্টা করে হাসি ঠাট্টার ভিতর দিয়ে ব্যাপারটা তরল করতে। সে যেন সলিলের বিয়ের কথা কিছুই জানে না।

প্রস্তাব করে, এবার একটা বিয়ে থা করো।

জানা-শোনা ক'নে আছে নাকি ?

আছে বৈকি।

সলিলের চেহারাটা হঠাৎ কঠিন হয়ে ওঠে।

সীমা তুমি সব জেনেশুনেই এসেছ। তবে জেনে যাও আমি এ বিয়ে করে সুখীই হয়েছি। আশা করি আর কোন চর পাঠাবে না।

সীমার চেহারাটা মুহূর্তের মধ্যে ফ্যাকাশে হয়ে যায়। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সে উঠে পড়ে। তারপর ক্ষিপ্রপদে বেরিয়ে যায়।

রাস্তায় নেমে এসে সে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। এমন ভাবে নাকাল হতে হবে সে ভাবতেও পারেনি। অলকের প্রতি রাগে ঘৃণায় সে প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। সে স্থির করে পরস্ত্রীকাতর মিথ্যাবাদী অলককে সে আর প্রশ্রয় দেবে না। দেখা হলে তাকে সে অপমান করতে ইতস্তত করবে না।

সীমা উঠে যেতেই সলিল ড্রইংরুমে পাইচারি করতে-করতে নিজের মনেই বেশ খানিকক্ষণ হেসে নেয়। সীমাকে জব্দ করতে পেরে সে যেন পরম তৃপ্তি বোধ করে। মনে-মনে ভাবে কি ভয়ঙ্কর প্রকৃতির মেয়ে সীমা।

ইদানীং কৈলি যখন তখন সলিলের কাছে আব্দার জানায়।

চল, সেই নালাটার ধারে একটু বেড়িয়ে আসি।

সলিল শুদ্ধ করে দেয়, তার কথাটা। নালা নয়, লেক। তাছাড়া যখন-তখন বেড়ানো যায় না। বেড়াবার একটা সময় আছে।

বেড়াবার যে সময়-অসময় আছে, কৈলি একথাটা প্রথম শোনে। সে অবাক হয়ে যায়। মনে পড়ে তার ময়নাপাড়ার কথা। যখন খুসী সে বেরিয়ে পড়ত, কোন বাধা নিষেধ ছিল না। শহরের বাধা নিষেধে সে যেন হাঁপিয়ে ওঠে।

সলিল লক্ষ্য করে তার ভাবান্তর। সে তাকে কাছে টেনে

নেয়। আশ্বাস দেয়, বিকেলে যাবে। খুসীতে চক্‌চক্‌ করে ওঠে কৈলির চোখ দুটো। সে আনন্দে স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরে।

সলিল তার কথা রাখে। শুধু লেকে নয়, সে কৈলিকে নিয়ে যায় চিড়িয়াখানা ও যাদুঘরে। জায়গাগুলো কৈলির কাছে স্বপ্নরাজ্য বলে মনে হয়। এতগুলো রকমারী জানোয়ার জীবিত ও মৃত কখনও সে একসঙ্গে দেখেনি। কল্পনাও করতে পারেনি সে ময়নাপাড়ায় থাকতে। বিস্ফারিত নয়নে সে ঘুরে-ঘুরে দেখে চিড়িয়াখানার জানোয়ারগুলোকে। ছোলা-মটর ছড়িয়ে দেয় খাঁচার মধ্যে। তাদের মুখব্যাদান দেখে সে হেসে ওঠে। জিরাফের গলায় সে হাত বুলোয়, হাতীর পিঠে চড়ে। সলিলকে ডাকে সে চেঁচিয়ে। হাতীতে উঠতে বলে। তার সরল-সহজ ভাব দেখে সলিল তৃপ্তি ও সঙ্কোচ দুইই বোধ করে।

হৈ-চৈ করে বেড়িয়ে-ফিরে কৈলি গোটা চিড়িয়াখানাটা। সে আদৌ ক্লান্তি বোধ করে না। সলিল বসে পড়ে খোলা জায়গায় ঘাসের উপর। ঘুরে-ফিরে কৈলি ফিরে আসে সলিলের কাছে। চিড়িয়াখানার জীবন্ত পশুগুলি দেখে তার আনন্দ ধরে না। কিন্তু যাদুঘরের মৃত জানোয়ার দেখে তার মন খুব খারাপ হয়ে যায়। সে ভাবে, শহরের মানুষগুলো কী নিষ্ঠুর। অতগুলো জানোয়ারকে মেরে তাদে' চামড়া ও হাড়গুলোকে সাজিয়ে রেখেছে। এতে কী লাভ হয়? সলিল বুঝিয়ে দেয়, যাদুঘরের স্বার্থকতা। কিন্তু তার কাছে এসব তথ্য দুর্বোধ্য।

আজ প্রায় মাসখানেক হয়ে গেল। ইলা অথবা মিঃ মুখার্জী কেউ আসেনি। ডাঃ রায়ের যেন একা-একা দিন কাটে না। বনবিহারীকেও তিনি আগের মত আমল দেন না।

মিঃ মুখার্জী পুলিশের লোক। তাঁর দৌড়-ঝাঁপের অন্ত নেই। ইলারও পরীক্ষার পড়া। অগত্যা সেদিন ডাঃ রায় বনবিহারীকে ডেকে পাঠান।

একবার ইলাদের বাড়ী যাও, দেখে এস সবাই ভাল আছে কি না।

আগের দিন হলে খুসী মনে ছুটে যেত বনবিহারী। কিন্তু এখন তার মন চায় না ইলাদের বাড়ীর দিকে যেতে। ইলার মুখের দিকে তাকিয়ে কথা কইবার সাহসটুকু সে যেন হারিয়ে ফেলেছে। সলিলের অপরাধের চেয়ে তার অপরাধ কম নয়। ইলা হয়ত তাকেও ক্ষমা করবে না।

কিন্তু বড়বাবুর হুকুম তামিল না করে উপায় নেই। অগত্যা বিকেলের দিকে বনবিহারী রওনা হয় ইলাদের বাড়ীব দিকে।

মৃণ্ময়ী দেবী বারান্দায় পাইচারী করছিলেন, হঠাৎ বনবিহারীকে আসতে দেখে তাঁর বুকের ভিতরটা অজানা আশঙ্কায় দুরু-দুরু করে ওঠে। নিশ্চয়ই কোন খারাপ খবর আছে। ডাঃ রায়ের অসুখের হয়ত বাড়াবাড়ি। তিনি ব্যগ্র হয়ে সকলের কুশল জিজ্ঞেস করেন।

বনবিহারী উত্তরে জানায়, সব ভাল।

কতকটা আশ্বস্ত হয়ে মৃণ্ময়ী তাকে বলেন, বিহারী আমার ঘবে এস, কয়েকটা জরুরী কথা আছে।

কথাটা যে কি তা বনবিহারীর বুঝতে বাকি নেই। সে এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করে। হঠাৎ ইলাকে এদিকে আসতে দেখে সে বেঁচে যায়। কাছে এগিয়ে গিয়ে বলে, দিদিমণি, বড়বাবু আমাকে তোমার কাছে পাঠালেন।

ইলা তাকে তার পড়ার ঘরে নিয়ে আসে।

মৃণ্ময়ী দেবীর জেরার হাত থেকে রেহাই পেয়ে বনবিহারী একটা

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। সে দোরগোড়ায় ধপাস করে বসে পড়ে।

ইলার যেন জানবার কিছুই নেই। 'রায়ভিলা' সম্বন্ধে তার সব প্রশ্ন শেষ হয়ে গেছে। তবু গতানুগতিক প্রশ্ন সে করে।

কাকাবাবু এখন কেমন আছেন ?

একই রকম। তোমাকে যেতে বলেছেন। তুমি গেলে তাঁর মনটা ভাল থাকে।

একটা অদ্ভুত হাসি ফুটে ওঠে ইলার ঠোঁটে।

বনবিহারী অপরাধীর মত নিঃশব্দে বসে থাকে।

ইলা বনবিহারীর জড়সড় ভাব দেখে না হেসে থাকতে পারে না। তার হাসিটা বনবিহারীকে যেন বিদ্রূপ করে। বনবিহারী নিজের সাফাই গেয়ে যায়। সলিল আর কৈলির বিয়ের কাহিনীটা সে সংক্ষেপে বলে। ইলা চুপ করে শোনে। কোন মন্তব্য করে না।

কাহিনীটা কোন রকমে শেষ করে বনবিহারী তার ধুতির খুঁট দিয়ে চোখ মোছে। হঠাৎ সে কেঁদে ফেলে।

ইলা বলে, তোমার কোন দোষ নেই বিহারীদা।

বনবিহারী তার গাফিলতি অস্বীকার করে না। যদি রঙের মোড়কটা মনে করে সঙ্গে নিয়ে শহরে যেতুম, তাহলে বোধহয় এ ঘটনাটা ঘটত না। কৈলির গায়ে রঙও পড়ত না আর তাকে বউ করেও ছোটবাবুকে আনতে হত না।

বনবিহারীর কথা শুনে ইলা বলে, এ নিতান্ত অদৃষ্টের পরিহাস। সে বনবিহারীকে সাবধান করে দেয়।

মাকে যেন এসব কথা বলো না বিহারীদা।

দিদিমণি, কবে যাবে বড়বাবুকে দেখতে ?

যাব'খন একদিন।

বনবিহারী চলে যেতেই মৃণ্ময়ী ইলার পড়ার ঘরে আসেন।

বিহারী কি বলে গেল? সে তো আমার সঙ্গে দেখা করে গেল না।

কাকাবাবু একবার যেতে বলেছেন। তাঁর শরীর ভাল নেই।

আমারও ঠিক তাই মনে আশঙ্কা হয়েছিল। তবে আমার মনে হয় ওবাড়ীতে আর বেশী যাতায়াত না করাই ভাল।

হঠাৎ যাওয়া-আসা বন্ধ করলে, আমাদের মনে যে এতদিন একটা স্বার্থ ছিল সেটা প্রকাশ হয়ে পড়ে না কি?

তাও তো বটে। তুই যা ভাল বুঝিস তাই কর মা, আমার মাথায় অত সব ভাল-মন্দর কথা আসে না। তবে সলিলের মত ছেলে এমন একটা কাণ্ড করে বসবে তা ভাবতেও পারিনি। এযুগে সবই সম্ভব দেখছি।

ইলা চেঁচিয়ে ওঠে, মা!

চুপ করেন মৃণ্ময়ী। আহত হয়ে ফিরে যান নিজের ঘরে।

ইলা নিজের আঘাতটা যতই চাপতে চেষ্টা করে, সেটা দ্বিগুণভাবে ঠেলে উঠতে চায়। শিক্ষা, কৃষ্টি ও সংযমের দোহাই দিয়ে সে চেষ্টা করে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে। সত্যিই সান্ত্বনা পায় কি না সে কে জানে?

সেদিন 'রায়ভিলা' থেকে হঠাৎ চলে আসাটা ইলার নিজের কাছেই কেমন বিশ্রী ঠেকে। যে আঘাতটা সে চেপে রাখতে গিয়েছিল, সেটা অসাবধানে যেন আত্মপ্রকাশ করে ফেলেছে। ডাঃ রায় হয়ত মনে করেছেন যে মনে আঘাত লেগেছে বলেই সে আর ওদিকে যাচ্ছে না। তাই সে স্থির করে কালই একবার যাবে 'রায়ভিলায়'।

পরদিন ইচ্ছে করেই ইলা ভাল করে সাজে। টিস্যুর শাড়ীখানার সঙ্গে মানানসই একটা ব্লাউজ পরে সে। বড় আয়নাটার মুখোমুখী দাঁড়িয়ে টয়লেটিং করে নেয়। পোষাকের চাকচিক্যে তার ক্লিষ্ট চেহারা অনেকটা যেন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বার কয়েক আয়নার মধ্যে নিজের চেহারাটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে নেয় সে। একটা তৃপ্তির কৃত্রিম নিঃশ্বাস ফেলে। তারপর একটা সোনালি জরি-দেওয়া ভ্যানিটি ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। যাবার সময় মৃণ্ময়ীকে চেঁচিয়ে বলে, মা আমি বেরুচ্ছি।

'রায়ভিলা' পৌঁছেই ইলা সরাসরি উঠে আসে দোতলায় ডাঃ রায়ের ঘরে। ডাঃ রায় তখন একটা ইংরেজী বই-এ মন নিবিষ্ট করার বৃথা চেষ্টায় রত। হঠাৎ ইলাকে দেখেই তিনি সোৎসাহে বলে ওঠেন, এস মা এস। তারপর কেমন আছ?

ভাল, আপনাকে দেখতে এসেছি।

বেশ-বেশ। টেনে-টেনে বলেন ডাঃ রায়।

গদী-আঁটা টুলটা টেনে নিয়ে ইলা ডাঃ রায়ের কাছ ঘেঁষে বসে। তার ঝলমলে পোশাকের দিকে নজর পড়তেই তিনি মনে করেন, সে আঘাতটা নিশ্চয়ই এতদিনে সামলে নিয়েছে।

ডাঃ রায় রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে ইলার সঙ্গে আলোচনা করতে ভালবাসেন। কারণ সে উগ্রপন্থী নয়। সে তার ব্যক্তিগত মত প্রকাশ করে। তার যুক্তি সব সময় উড়িয়ে দিতে পারেন না তিনি। বরঞ্চ অনেক সময় তাঁকে মেনেই নিতে হয়। একথা সেকথার পর তিব্বতের কথা এসে পড়ে। তারপর ভারতের সঙ্গে চীনের ভবিষ্যৎ সম্পর্ক, রাশিয়ার হুমকী, আসামের বঙ্গাল-খেদা। ইতিহাসের নজির দেখিয়ে ডাঃ রায় বিশ্লেষণ করেন, চীন, তিব্বত ও ভারতের রাজনৈতিক সম্পর্কটার গুরুত্ব। ইলা একমনে শুনে যায় তাঁর মতামত।

ইদানীং সলিল ও কৈলি কোথাও বেরুবার আগে ডাঃ রায়ের সঙ্গে দেখা করে যায়। ডাঃ রায় তাঁর বিরূপ ভাবটাকে যথাসাধ্য আয়ত্তে রাখতে চেষ্টা করেন। কখনও পারেন, কখনও পারেন না।

কৈলি ইলাকে দেখেই সোল্লাসে চেঁচিয়ে ওঠে, আরে দিদি যে। সঙ্গে-সঙ্গে সে তার একটা হাত চেপে ধরে। সলিলও সহজ হতে চেষ্টা করে।

কতক্ষণ এসেছ ?

এই খানিকক্ষণ। নির্লিপ্তভাবে জবাব দেয় ইলা।

কৈলি আব্দার জানায়, চলো দিদি গঙ্গার ধারে একটু বেড়িয়ে আসি।

আজ থাক। আরেকদিন যাব। ইলা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে।

ইলা লক্ষ্য করে কৈলির সাজ-পোষাক। তাকে ময়নাপাড়ার সেই কৈলি বলে চেনাই যায় না। একেবারে বদলে গেছে সে। পোষাক পরিচ্ছদে, আদব কায়দায় সে অতি আধুনিকা মহিলাকে যেন ছাড়িয়ে গেছে।

কৈলি আবার অনুরোধ করে, চলো দিদি।

সলিলও তার কথার উপর জোর দেয়। চল না একটু ঘুরে আসবে।

শেষে ডাঃ রায় বলেন, যাও একটু ঘুরে এস মা।

কৈলি নাছোড়বান্দা। সে একপ্রকার জোর করে হাত ধরে ইলাকে টুল থেকে টেনে তোলে। ইলা বাধ্য হয়ে তাদের সঙ্গে যন্ত্রচালিতের মত নেমে আসে সিঁড়ি বেয়ে।

সলিল গিয়ে বসে ড্রাইভারের সীটে। অন্যান্য দিনের মত কৈলিও বসতে যায় তার পাশে। সলিল চোখের ইশারায় দেখিয়ে দেয় পেছনের সীটটা। তার ইঙ্গিতটা ইলার দৃষ্টি এড়ায় না।

সে কৈলকে বলে, সুমুখে গিয়ে বস।

সলিল তার নির্দেশের স্বপক্ষে যুক্তি দেখায়, কৈলি যখন-তখন এক্সিলারেটর চেপে ধরে। এক্সিডেন্ট হতে পারে।

অভিযোগটা কৈলি অস্বীকার করে না। ছেলেমানুষের মত সে বলে ওঠে, একদিন মাত্র ওরকম করেছিলাম দিদি।

ইলার চোখে বেশ লাগে দুজনের কৃত্রিম মান অভিমান ও ঝগড়াটা দেখতে। সঙ্গে-সঙ্গে অজ্ঞাতসারে একটা চাপা ঈর্ষার নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে তার। কৈলি কিন্তু বিন্দু-বিসর্গও টের পায় না। কি জানি কি ভেবে নিয়ে শেষে কৈলি এসে বসে ইলার পাশে পেছনের সীটে।

সলিল গাড়ীটাকে আউটরাম ঘাটের কাছে বড় রাস্তার ধার-ঘেঁষে দাঁড় করায়। ইলার হাত ধরে কৈলি নেমে আসে। তিনজনে এসে দাঁড়ায় কাঠের বিরাট পাটাতনটার উপর। গঙ্গার বুকের উপর বড়-বড় বিদেশী জাহাজগুলো নোঙর করে রয়েছে। বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে কৈলি ওদিকে। সলিল তাকে বোঝায়, সাত সমুদ্র তের নদীর ওপার থেকে এসেছে জাহাজগুলো। অদূরে একটা লঞ্চ জল কেটে বেরিয়ে যায়। আনন্দে কৈলি হাততালি দিয়ে ওঠে। তার ছেলেমানুষী দেখে সলিল সঙ্কোচ বোধ করে। ইলা হেসে ফেলে তার শিশুসুলভ স্বভাব দেখে।

জলের ঢেউগুলো দেখতে কৈলির বেশ লাগে। পাটাতনের নীচে এসে ঢেউগুলো আছড়ে পড়তেই অতবড় পাটাতনটা দুলে ওঠে ক্ষণিকের জন্যে। কৈলিও কেঁপে ওঠে। সে সলিলের ডান হাতটা ধরে ফেলে। একটা নৌকাকে ঢেউয়ের ধাক্কায় নাস্তানাবুদ হতে দেখে সোল্লাসে সে চেঁচিয়ে ইলাকে বলে, ওই দেখ দিদি।

সঙ্গে-সঙ্গে তার মনটা বিপদগ্রস্ত যাত্রীদের জন্যে অনুকম্পায় ভরে

ওঠে। তার উল্লাসে ভাটা পড়ে।

সলিল তাকে বুঝিয়ে দেয়, সব ঠিক হয়ে যাচ্ছে। মাঝিরা ঢেউ কাটাতে অভ্যস্ত।

ওপারের সারি-সারি বাতিগুলো হঠাৎ একসঙ্গে জ্বলে ওঠে। ভারী সুন্দর ও আশ্চর্য লাগে কৈলির চোখে। সে সলিল ও ইলার দৃষ্টি আকর্ষণ করে ওদিকে চেঁচিয়ে। ওই দেখ কী সুন্দর!

সে নিজে মন্ত্র-মুগ্ধের মত তাকিয়ে দেখে জাহাজ, লঞ্চ, আলো, ঢেউ সব।

ইলা বসে পড়ে একটা বেঞ্চির উপর। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে পা দুটো তার যেন ভারী হয়ে উঠেছে। সলিল এসে বসে খানিকক্ষণ পর। গঙ্গার স্রোতের মুখে কি একটা জিনিষ ভেসে আসছে। জলের ঘুরপাকের মধ্যে একবার তলিয়ে যায়, আবার ভেসে ওঠে। কৈলি পাটাতনের শেষপ্রান্তে এসে দাঁড়ায়। বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে সে জিনিষটাকে, কিন্তু বুঝতে পারে না। কুমীর কিনা ভাল করে পরখ করে দেখতে চেষ্টা করে। সে একবার একটা কুমীর দেখেছিল ময়নাপাড়ার ঝিলে।

সলিল তাকায় ইলার দিকে, মুগ্ধ দৃষ্টিতে। ইলা যেন থেকে থেকে ঘেমে ওঠে তার দৃষ্টিতে। অথচ এ দৃষ্টিকে সে কিছুদিন পূর্বেও সহ্য করেছে, উপভোগ করেছে। কিন্তু আজ পারে না।

কী দেখছ? প্রশ্ন করে ইলা।

অপূর্ব সুন্দর লাগছে তোমাকে।

বেশ ফ্ল্যাটারী করতে শিখেছ দেখছি।

ফ্ল্যাটারী নয়, সত্যিই বলছি। সলিলের গলার স্বরটা একটু ভারী হয়ে ওঠে, কেঁপেও ওঠে। মুহূর্তের মধ্যে সে দুর্বলতায় ভেঙে পড়ে। বলে, আমি কাঞ্চন ফেলে কাচ গ্রহণ করেছি ইলা।

ইলার চোখে সলিল মুহূর্তের মধ্যে আরো ছোট হয়ে যায়।

কোনরকমে বিরক্তিভাবটা সে চেপে বলে, এখন ওঠা যাক।

আর একটু বস। আমার বিশেষ কথা আছে।

আমার সব কথা ফুরিয়ে গেছে, নির্লিপ্তভাবে জবাব দেয় ইলা।

কৈফিয়ৎ দেয় সলিল। আমি স্বেচ্ছায় বিয়ে করে আনিনি কৈলিকে। অবস্থা বিশেষে...

থাক, শাক দিয়ে আর মাছ ঢেকো না।

ধমক খেয়ে সলিলের মুখের স্বাভাবিক রঙটা বদলে যায়। সে তার মানসিক অবস্থাটা ব্যক্ত করার ভাষা খুঁজে পায় না। পরিকল্পিত কৈফিয়ৎগুলো যেন জট পাকিয়ে যায়।

সে প্রশ্ন করে, তুমি যদি এমন একটা ভুল করতে ?

স্পষ্ট উত্তর দেয় ইলা, অনুশোচনা করতাম না, ভুলের মাশুল দিতে কুণ্ঠিত হতাম না। তা'ছাড়া...

তা'ছাড়া কী ?

ইলার কণ্ঠস্বর আরো দৃঢ় হয়ে ওঠে। আমি কখনও বিবেককে ঠকাতাম না।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে ইলা আবার বলে, তোমার মনে পড়ে, তোমাকে আমি কতবার সাবধান করে দিয়েছি ছেলেমানুষী স্বভাব ছাড়তে।

অস্বীকার করে না সলিল। অপরাধীর মত মাথা নীচু করে বসে থাকে সে। খানিকক্ষণ পর সে বলে, আমাদের ব্রত উদ্‌যাপনের কি হবে ?

সশব্দে হেসে ওঠে ইলা। ছলচাতুরীও শিখেছ দেখছি।

সজল কণ্ঠে সলিল মিনতি জানায়।

আমাকে আর আঘাত করো না ইলা। আমি আর সইতে পারছিনে। তুমি যদি কৈলিকে বিয়ে করার পরিস্থিতিটা জানতে তা'হলে নিশ্চয়ই আমার এভাবে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিতে না।

আমি সব জানি, দৃঢ় কণ্ঠে বলে ইলা।

সলিল অবাক হয়ে যায়।

কী করে জানলে ? কে বললে, বনবিহারী বুঝি ? সে স্বস্তি বোধ করে। তাকে আর আনুপূর্বিক ঘটনাটা নতুন করে বলতে হবে না। বনবিহারী ভালই করেছে। তাকে একটা কঠিন কাজ থেকে অব্যাহতি দিয়েছে।

সব জেনে শুনে কি তুমি আমাকে ক্ষমা করতে পার না ইলা ?

তুমি যদি কৈলিকে ফেলে কাপুরুষের মত পালিয়ে আসতে অবশ্যই তোমাকে ক্ষমা করতে পারতাম না।

অদৃষ্টের পরিহাস। স্বগত মন্তব্য করে সলিল।

ততক্ষণে কৈলি বসে বসে নিবিষ্ট মনে উপভোগ করছে গঙ্গার বুকের উপর বিচিত্র ঢেউয়ের খেলা।

সলিলের মনটা হঠাৎ যেন বেপরোয়া হয়ে ওঠে। আজ একটা মীমাংসা সে করে ফেলতে চায়। এভাবে তিলে-তিলে সে নিজেকে অনুশোচনায় পুড়িয়ে মারতে চায় না। ইলার দিকে মুখটা সোজা করে বসে সে।

তুমি কি আমার জীবনে আর ফিরে আসতে পার না ইলা ?

কয়েক মুহূর্তের জন্যে দৃষ্টিটা গঙ্গার দিকে নিবদ্ধ করে রাখে ইলা। তারপর সলিলের দিকে তাকিয়ে বলে, গাছের গোড়া কেটে আগায় জল দিলে গাছের প্রাণ ফিরে আসে না। অনর্থক অভিনয় করো না।

সলিলের মুখের উপর থেকে খানিকটা রক্ত যেন হঠাৎ সরে যায়। মুখটা সাদা ব্লটিং পেপারের মত ফ্যাকাশে দেখায়।

আবার একটা খোঁচা দেয় ইলা।

তুমি তো ভুল করনি। তোমার মন-প্রাণ যা চেয়েছিল, তা-ই করেছ এবং পেয়েছ।

মুখর সলিল যেন বোবা হয়ে যায়।

ইলা বলে যায়, শিকার যখন ধরা পড়ে, হাতে এসে যায়, তখন শিকারীর আর উৎসাহ থাকে না। নতুন শিকারের উদ্দেশ্যে সে আবার অভিযান সুরু করে। বিদ্রূপের দৃষ্টি হানে ইলা সলিলের মুখের দিকে। সলিল তার দৃষ্টিতে ঘেমে যেন স্নান করে ওঠে। ইলার মুখে একটা আত্ম-তৃপ্তির ভাব ফুটে ওঠে। মনের জ্বালাটা মিটিয়ে নেয়। সে হঠাৎ উঠে পড়ে কৈলির দিকে এগিয়ে যায়। কৈলি যেন আত্মস্থ হয়েছিল এতক্ষণ। ইলার পায়ের শব্দে সে চমকে ওঠে, ফিরে তাকায়।

এখন ওঠ, বাড়ী যেতে হবে, ইলা বলে।

আর একটু বস। চোখে কাতর মিনতি ফুটে ওঠে কৈলির।

অগত্যা ইলা তার পাশেই বসে পড়ে।

অদূরে বেঞ্চিটার উপর বসে সলিল তুজনকে লক্ষ্য করে। তাদের রূপের তুলনা করতে গিয়ে তার নিজেরই হাসি পায়। মনে হয়, মাল্‌কিনীর পাশে যেন কালো কুৎসিত একটা আয়া। ময়নাপাড়ার সেই অজন্তা ইলোরার জীবন্ত মূর্তি শহরের পরিবেশে মুহূর্তের মধ্যে সলিলের চোখে নিষ্প্রভ অপাংক্তেয় হয়ে পড়ে।

ময়নাপাড়ায় থাকতে সলিল অনেকদিন মনে-মনে তুলনা করে দেখেছে কৈলি আর ইলার মধ্যে। কৈলিই প্রাধান্য পেয়েছে তার স্বাস্থ্যের জৌলুষের দরুণ। ইলা তার কাছে মোমের পুতুল বিশেষ মনে হয়েছে। আর আজ? পরিবেশের প্রভাবটা সলিল আজ মনে-প্রাণে স্বীকার করে। সঙ্গে-সঙ্গে ইলার জ্ঞান, শিক্ষা ও কৃষ্টির কথা ভেবে সে অভিভূত হয়ে পড়ে। ইলা সমুদ্র আর কৈলি তার কাছে পাহাড়ী জলা বিশেষ।

অনুশোচনায় ভেঙে পড়ে সে।

খানিকক্ষণ পর ইলা আর কৈলি উঠে আসতেই সলিলও উঠে পড়ে। কিন্তু তার মনে হয় এই অল্প সময়ের মধ্যে তার দৈহিক

ও মানসিক শক্তিটুকু যেন নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে।

তিনজন ফিরে আসে গাড়ীতে। সলিল ড্রাইভ করে। গাড়ী চালাতে-চালাতে তার মনে হয় যদি ভয়ঙ্কর একটা দুর্ঘটনা ঘটে, মন্দ হয় না। সব দ্বন্দ্ব চুকে যায় চিরতরে। খুব জোর ছোটায় সে গাড়ীটা। আশঙ্কায় বুক কেঁপে ওঠে ইলার। খানিকটা পথ আসার পর পুলিশের হাতের নির্দেশে গাড়ীটাকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও দাঁড় করাতে হয়। সঙ্গে-সঙ্গে সলিলের উত্তেজনা যেন কমে আসে।

ইলা একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

সলিলের রাগটা গিয়ে পড়ে নিরীহ ট্রাফিক পুলিশটার উপর। সঙ্কেত পেয়ে আবার গাড়ীটা চলতে সুরু করে। সে স্পীড বাড়িয়ে দেয়। অল্প সময়ের মধ্যেই গাড়ী এসে দাঁড়ায় 'রায়ভিলার' গাড়ী বারান্দার নীচে।

ইলা নেমে কৈলির কাছে বিদায় নেয়, বলে, আর উপরে যাব না ভাই।

সলিল কৈলিকে উদ্দেশ্য করে বলে, তুমি উপরে যাও, আমি এক্ষুনি ইলাকে পৌঁছে দিয়ে ফিরছি। ইলা বারণ করে, প্রয়োজন নেই। আমি একাই যেতে পারবো।

সলিল তার কথা গ্রাহ্য করে না। ইলা আর কথা বাড়ায় না। তাকে ফ্রন্ট-সীটে বসতে অনুরোধ জানায় সলিল।

ইলা বলে, পেছনের সীটেই বসছি আমি।

সলিল উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

আমার একটা সামান্য অনুরোধও কি তুমি এখন রাখতে পার না?

ইলা জানে সলিলের স্বভাব। এক্ষুনি হয়ত চেঁচিয়ে একটা সিন্ করবে। তাই আর কথা না বাড়িয়ে সে নীরবে এসে বসে সলিলের পাশে। পুরানো দিনের বন্ধুত্বটা যেন ফিরে পায় সলিল।

সে আবার মুখর হয়ে ওঠে,' গাড়ীর স্পীডটা কমিয়ে দেয়।

না অনুরোধ জানায় গাড়ীর স্পীড বাড়াবার জন্যে। সলিল মুচকি হাসে। হঠাৎ সে ইলার ডান হাতটার উপর তার বাঁ হাত দিয়ে একটা চাপ দেয়। সঙ্গে-সঙ্গে সে কাতর কণ্ঠে মিনতি জানায়, ইলা আমাকে বাঁচাও, রক্ষা করো।

ইলার চোখে পড়ে একটা কুকুর গাড়ীর সম্মুখে এসে পড়েছে।

ব্রেক কস। বলে সে চেঁচিয়ে ওঠে।

সলিলের বাঁ হাতটা সরে যায় ইলার হাতের উপর থেকে। কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করতে-করতে অপর ফুট-পাথের দিকে সরে যায়। খানিকক্ষণ পর ইলাদের গাড়ীবারান্দার নীচে এসে গাড়ীটা দাঁড়ায়। ইলা নিজেই দরজা খুলে নেমে পড়ে।

সলিল তার প্রশ্নের জবাবের জন্যে তাকায় তার দিকে। ইলা তার চাহনির অর্থ যেন বুঝেও বুঝে না।

আমার প্রশ্নের জবাব দিলে না ?

মুহূর্তের মধ্যে ইলা কি ভেবে নেয়। সহজভাবেই সে বলে, আমি তোমাকে বাঁচাবো। খুসীতে সলিলের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আগ্রহের সঙ্গে সে প্রশ্ন করে, সত্যি বলছ ইলা ?

সত্যিই বলছি। হঠাৎ সশব্দে গাড়ীর দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ইলা সরে যায়।

আজ থেকে তোমায় আমি মুক্তি দিলাম। আমায় ভুলে যাও সলিল। বলেই ক্ষিপ্রপদে সে উঠে যায় দোতলায়।

সলিল প্রথমটা যেন হতভম্ব হয়ে যায় ইলার নাটকীয় আচরণে। গাড়ীটা চালিয়ে নেওয়ার শক্তিটুকুও যেন সে হারিয়ে ফেলে। কয়েক গজ রাস্তা সে মন্থর গতিতে চালায় গাড়ীটাকে, তারপর পুর্ণ গতিতে। ঝড়ের বেগে সশব্দে ছে.টে গাড়ীটা।

জানালা দিয়ে ইলা দেখে। গাড়ীটা চোখের আড়াল হতেই

সে এসে লুটিয়ে পড়ে বিছানার উপর। তার বুকের ভিতরটা আশঙ্কায় দুরু-দুরু করতে থাকে। যদি দুর্ঘটনা ঘটে।

সেদিন ইলার অভাবিত আচরণে আঘাত পেয়ে এসে সলিল মনে-মনে স্থির করে সে ভুলে যাবে তাকে সম্পূর্ণভাবেই। কৈলিকে মনের মত গড়ে তুলে ইলার চোখে তাকে ঈর্ষার বস্তু করে তুলবে।

সকালে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে-দিতে সলিল পত্রিকার উপর চোখ বুলোয়। কৈলি তার কাছ ঘেঁষে বসে। কিন্তু তার চোখে ছাপা কালির লেখাগুলো নিরর্থক। তার চোখ খোঁজে জন্তু জানোয়ারের ছবি, শিকারের ছবি। কোন জানোয়ারের ছবি চোখে পড়লে সে ঝুঁকে দেখে। সে তার শিশুসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করে রকমারী ছবিগুলো। কখনও-কখনও সলিল কৈলির আব্দার রক্ষা করে। বুঝিয়ে দেয়, ছবিগুলোর উদ্দেশ্য, স্বার্থকতা বিদেশের নানা পশু-পাখীর গল্পও বলে। অবাক হয়ে শোনে কৈলি। সশ্রদ্ধ ও মুগ্ধ নয়নে সে তাকায় স্বামীর দিকে। কথায়-কথায় সলিল চেষ্টা করে কৈলির কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনটাকে ঘসে-মেজে আনতে শিক্ষিত জগতে।

বিজ্ঞানের অভাবিত সাফল্য সে বোঝাতে চেষ্টা করে। বিজ্ঞানীরা নানা গবেষণা করে অসম্ভবকেও সম্ভবপর করে তুলেছে। এমন কি গর্ভবতীর রক্ত পরীক্ষা করে ডাক্তার বলে দিতে পারে ছেলে কি মেয়ে হবে।

অবিশ্বাসের হাসি হাসে কৈলি। সে বলে, ভগবান ছাড়া ও-কথা আর কেউ বলতে পারে না।

সলিলের মনটা মাঝে-মাঝে দমে যায়। বেনাবনে মুক্তো ছড়াতে তার আর ভাল লাগে না। আবার ঘুরে ফিরে মনে পড়ে তার

ইলার কথা। তার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কথা, রাজনীতির কথা, অর্থনীতি ও সামাজিক রীতিনীতি সম্বন্ধে অলোচনা করে কত তৃপ্তি হত। এখন একতরফা বকে যায় সে। কৈলির দিক থেকে কোন যুক্তি বা প্রতিবাদ আসে না। তার মনে হয়, সে যেন একটি মূক-বধির নিষ্প্রাণ মহিলার মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে নিষ্ফল চেষ্টা করছে।

কৈলি এখন সন্তান-সম্ভবা। দাম্পত্য সুখের ও মাতৃত্বের ইঙ্গিতে সে একটা চাপা তৃপ্তি অনুভব করে। অতীত দিনের গ্লানি ধীরে-ধীরে ধুয়ে মুছে যায়। একটা নতুন আনন্দময় জীবনের কল্পনায় সে মেতে ওঠে।

সলিলের মনেও একটা আশার আলো ফুটে ওঠে। সে ভাবে এই সরল অশিক্ষিত কৈলিকে যুগোপযোগী করে তোলা হয়ত অসম্ভব হবে না। তার মনে পড়ে মুখার্জী কাকার উপদেশ। মনের বল সে অনেকটা ফিরে পায়।

এদিকে কাজকর্মে বনবিহারীর উৎসাহ দ্বিগুণ বেড়ে যায়। বাড়ীতে একটি শিশু আসার সম্ভাবনার আনন্দে সে মেতে ওঠে। কাজের ফাঁকে-ফাঁকে সে গুণগুণ করে গান করে। তার আশা, এতদিনে হয়ত আধভাঙা সংসারটা জোড়া লাগবে।

নার্সের মারফতে কৈলির মাতৃত্বের সম্ভাবনার শুভ সংবাদটা ডাঃ রায়ের কানে আসে। সংবাদটা পাওয়া মাত্রই তাঁর মুখে একটা খুসীর ভাব ফুটে ওঠে ক্ষণিকের জন্যে। তাঁর ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হয়ে ওঠে। একটা ক্রূর হাসি দেখা দেয় তার মুখে। আড়াল থেকে মনিবের এই ভাবান্তর লক্ষ্য করে নবিহারী মুষড়ে পড়ে।

ডাঃ রায়ের মাথার মধ্যে নানা চিন্তা এসে জড় হতে থাকে।

অদৃষ্টের পরিহাসে সাঁওতালের গর্ভের সন্তানই হবে এই রায় পরিবারের উত্তরাধিকারী। যে আভিজাত্য, শিক্ষা ও কৃষ্টির গর্বে রায়পরিবার এতদিন মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, তা ধূলিসাৎ হতে চলেছে। কারণ, তাঁর আশঙ্কা সাঁওতালের গর্ভের সন্তানের পক্ষে আভিজাত্য রক্ষা করা সম্ভব নয়।

ডাঃ রায় ভাবতে ভাবতে ক্লান্ত হয়ে পড়েন। তিনি জানেন সন্তানের উপর মায়ের প্রভাবটা বেশী পড়া স্বাভাবিক। তাই তিনি এক-একবার ভাবেন সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি কোন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে দান করে দেবেন। কিন্তু তিনি যতই কঠোর নীতি গ্রহণ করার সঙ্কল্প করেন, ততই একটা অজানিত দুর্বলতা এসে তাকে কাবু করে ফেলে। একটি অনাগত শিশুমুখ তাঁর কঠিন সঙ্কল্পের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। এই এক ফোঁটা দুর্বলতার মোহ তাঁর পক্ষে পর্বতপ্রমাণ বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তিনি অস্থিরভাবে ঘন-ঘন পাইচারী করতে থাকেন।

মৃণ্ময়ী লক্ষ্য করেন, ইলার ভাবান্তর। ফাইন্যাল পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু তার চেহারা ও মনের মধ্যে আগের সেই স্বাভাবিক প্রফুল্লতা ফিরে আসে না। ইদানীং হঠাৎ দেখলে মনে হয়, বয়সটা যেন তার এ ক'দিনে অনেকখানি বেড়ে গেছে।

তিনি ইলাকে ডেকে বলেন, দার্জিলিং থেকে সুনন্দা লিখেছে, কিছুদিন তার ওখানে বেড়িয়ে আসার জন্যে।

কি একটু ভেবে নিয়ে ইলা বলে, বেশ তো লিখে দাও, আমরা যাব।

চিঠি দেখবার জন্যে এতটুকু আগ্রহ সে প্রকাশ করে না।

মৃণ্ময়ী একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, ক'দিন

ঘুরে এলেই মেয়ের মনটা আবার চাঙা হয়ে উঠবে। স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হবে। যেতে যদি হয় বেশী দেরী করে লাভ নেই। আসছে রোববারই রওনা হবো, বলেই মৃণ্ময়ী একটা চিঠি লেখার প্যাড ইলার দিকে এগিয়ে দেন।

আজই লিখে দে এক্সপ্রেস চিঠি, যতীশ ও সুনন্দা যেন ষ্টেশনে থাকে।

ইলা যে এত সহজে দার্জিলিং যাবার প্রস্তাবটা লুফে নেবে তা সত্যি মৃণ্ময়ী ভাবতে পারেন নি। চিঠি লেখা শেষ হতেই তিনি ইলার কাছে এসে দাঁড়ান।

কি লিখলি শুনি?

লিখলাম, রোববারই যাচ্ছি ট্রেনে। জামাইবাবু ও দিদি যেন যথা সময়ে দার্জিলিং ষ্টেশনে উপস্থিত থাকেন।

ইলা চিঠিটা খামে বন্ধ করে দরোয়ানের হাতে দিয়ে বলে, এক্ষুণি ডাকবাক্সে ফেলে এসো।

ইলাদের বিরাট বাড়ীটা দক্ষিণে খোলা। মুক্ত হাওয়া ঘরের মধ্যে ঝড় বইয়ে দেয়। তবুও তার মাঝে-মাঝে মনে হয়, এ ঘরটায় তার দম যেন বন্ধ হয়ে আসে। কোলকাতার হাওয়া, পরিবেশ সব কিছুই তার কাছে যেন বিষিয়ে উঠছে। সে অন্য কোথাও পালাতে পারলে বাঁচে। তার মন শুধু বলে,

"হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে।"

মৃণ্ময়ী বলেন, যাবার আগে একবার তোর কাকাবাবুকে দেখে আসবিনে?

সময় পেলে যাবো একবার। মিথ্যা আশ্বাস দেয় ইলা।

রোববার দিন বাড়ীর দরোয়ান ও বাগানের মালীর উপর

বাড়ী-ঘর-দোর তদারকের ভার দিয়ে মৃণ্ময়ী ও ইলা রওনা হয়। রেলের প্রথম শ্রেণীর বার্থ আগে থেকেই রিজার্ভ করা ছিল।

যতীশ দার্জিলিং-এর ডেপুটি কমিশনার। নির্জন পরিচ্ছন্ন পরিবেশে বিরাট কোয়ার্টার। অতবড় কোয়ার্টারে দুটি মাত্র প্রাণী থাকে। যতীশ আর সুনন্দা। সম্প্রতি যতীশের ছোট ভাই মনীশ বিলেত থেকে ফিরে এসেছে ডিফিল হয়ে। কিছুদিন এখানে থেকে সে কোলকাতায় একটা প্রথম শ্রেণীর কলেজে অধ্যাপনার কাজে যোগদান করবে। প্রায়ই সে যাওয়ার নোটীশ দেয় সুনন্দাকে কিন্তু আজ কাল করে তারিখটা পেছিয়ে যায়।

সুনন্দা মন্তব্য করে, কাজ তো মাষ্টারী। দু'চারদিন এদিক সেদিক হলে কিছু এসে যাবে না।

কথাটা যতীশের কানেও যায়। সে মাষ্টারী কাজের সম্বন্ধে একটা ব্যঙ্গ উক্তি করে।

সুনন্দা মনীশের হয়ে জবাব দেয়, শুধু ক্ষমতা ও অর্থের মাপকাঠিতে চাকুরীর বিচার করলে চলে না। অর্থ অনেক আজে-বাজে লোকও প্রচুর রোজগার করে।

যতীশের বুঝতে বিলম্ব হয় না যে তার বেফাঁস উক্তিটার জের খানিকক্ষণ চলবে। তাই সে আলোচ্য বিষয়টার মোড় ঘুরিয়ে দেয়।

আজই তো মাসীমার আর ইলার আসার কথা। যাঃ, ভুলেই গিয়েছিলাম। ষ্টেশনে কে যাবে?

আব্দারের সুরে সুনন্দা বলে, তুমিও চলো।

আমাকে বিশেষ কাজে বেরুতে হবে। দু-একদিনের মধ্যেই মন্ত্রী আসছেন সাঙ্গোপাঙ্গ সহ। তুমি বরঞ্চ মনীশকে সঙ্গে নিয়ে

ষ্টেশনে যাও।

মনীশ পার্টিশনের অপর দিকে বসেছিল। হঠাৎ দাদার রায় শুনে তার মাথায় যেন বাজ পড়ে। সে ষ্টেশনে যাওয়ার ব্যাপারটা এড়াবার জন্যে মনে-মনে কৈফিয়ৎ খোঁজে। উঠে এসে আমতা-আমতা করতে থাকে।

সুনন্দা তার অবস্থাটা আঁচ করে নেয়।

খুব হয়েছে। কোন কৈফিয়ৎ দিয়ে এড়াবার নিষ্ফল চেষ্টা করো না।

যতীশ গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে যায়। চেঁচিয়ে জানিয়ে যায়, ফিরতে হয়ত দেরী হতে পারে।

মনীশ শান্তিপ্রিয় লোক। সে সংসারের সাতে-পাঁচে থাকে না। যখন-তখন সে নিজেকে একগাদা বইয়ের মধ্যে ডুবিয়ে রাখতে ভালবাসে।

যতীশ মাঝে-মাঝে মন্তব্য করে, বুকওয়ারম্, হোপলেশ।

সে এতে রাগ করে না। বরঞ্চ এতে তার বই প'ড়ার ঝোঁকটা যেন আরো বেড়ে যায়। সুনন্দা আপন-ভোলা মনীশকে কোন কাজের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারে না। তবুও ছাই ফেলতে ভাঙা কুলোর ডাক পড়ে।

সুনন্দা বেরুবার জন্যে তৈবি হয়। মনীশকে সে নির্দেশ দেয, ভালো স্যুট পরে তৈরি হতে।

এমন সময় কালিম্পং-এর মিসেস কাউড্রি এসে হাজির হন।

সুনন্দা মনীশকে উদ্দেশ করে বলে, তুমি একাই যাও, মাসীমাকে বলো, একটা বিশেষ কাজে আটকা পড়ে গেছি। বাড়িতে অতিথি এসেছেন।

মিসেস কাউড্রি বাধা দিয়ে বলেন, আপনার প্রোগ্রাম বাতিল করবেন না। আমি বরঞ্চ আরেকদিন আসব।

সুনন্দা আবার মনীশকে বলে, তুমি বেরিয়ে পড়।

সুবোধ বালকের মত মনীশ বিনা প্রতিবাদে ষ্টেশনের দিকে পা বাড়ায়। তার পোষাকের দিকে চোখ পড়তেই সুনন্দার মনটা বিরক্তিতে ভরে ওঠে। কোনদিন যদি এতটুকু খেয়াল থাকে। দেহের তুলনায় কোটটা যেন অনেকখানি বড় দেখায়। মনে হয় অন্য কারোর কোট সে পরেছে।

সে বেরিয়ে যেতেই মিসেস কাউড্রি প্রশ্ন করেন, ভদ্রলোকটি কে?

আমারই দেওর মনীশ রে। সম্প্রতি বিলেত থেকে ডি-ফিল হয়ে এসেছেন।

মিসেস কাউড্রির ঠোঁটের উপর একটা বিদ্রূপের হাসি খেলে যায়।

ওঃ এই সেই বিখ্যাত মনীশ? আমি ভেবেছিলাম, আমার ছোট বোন মিলির সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেব, কিন্তু···

কিন্তু কি মিসেস কাউড্রি?

আপনার মুখে ভদ্রলোকের সুখ্যাতি শুনে ছুটে এলাম, কালিম্পঙ থেকে, কিন্তু ...

কিন্তু কি?

ভেরী আন্‌স্মার্ট, আনইম্প্রেসিভ। মিলি হয়ত বন্ধু হিসাবে ওকে গ্রহণই করবে না।

একথায় সুনন্দার চোখে-মুখে বিরক্তির আভাষ ফুটে ওঠে। প্রতিবাদ না জানিয়ে সে থাকতে পারে না।

আমার দেওর বলে নয় মিসেস কাউড্রি, এমন গুণী ছেলে বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না। বিশেষ করে আজকালকার যুগে।

হাসালেন মিসেস রে। আজকালকার সমাজে শুধু লেখাপড়ার দোহাই দিয়ে চলে না। শিক্ষার সঙ্গে চাই আধুনিক রুচি, স্মার্টনেস, তদুপরি চেহারা, স্বাস্থ্য।

চাইতো অনেক কিছু। এতো আর ইন্‌ডেণ্ট মিলিয়ে জিনিষ কেনা নয়! আমরাও তো মনীশের জন্যে শিক্ষিতা, স্বাস্থ্যবতী, সুরুচিসম্পন্না মেয়ে চাই। যা'তা মেয়ে তার সঙ্গে মানাবে কেন?

সুনন্দার খোঁচাটায় মিসেস কাউড্রি আহত হন। তাঁর মুখটা মুহূর্তের মধ্যে বিবর্ণ হয়ে যায়। তিনি রঙীন ছাতাটা নিয়ে ত্রস্তে উঠে পড়েন।

আরেকটু বসুন। কফি তৈরী হয়ে গেছে।

সঙ্গে-সঙ্গে কাঞ্চী ডিস ভরতি খাবার ও কফি নিয়ে আসে। ধন্যবাদ জানিয়ে মিসেস কাউড্রি বেরিয়ে যান।

সুনন্দা এসে বসে বারান্দার চেয়ারটার উপর। খানিকক্ষণ রাগে ও অপমানে সে ফুলতে থাকে। সে কোনদিনই মিসেস কাউড্রিকে সহ্য করতে পারে না। তবু ভদ্রতার খাতিরে তাকে আমল দিতে হয়। তাছাড়া কালিম্পঙে গেলে তারা মিঃ কাউড্রির বাড়ীতেই ওঠে। এই সূত্রে দুই পরিবারের মধ্যে মেলামেশা হয়েছে।

হাতঘড়িটার দিকে তাকাতেই সুনন্দার মনে পড়ে, ইলাদের আসার সময় পার হয়ে গেছে। তারা তো এখনও এলো না। ভাবিত হয়ে পড়ে সে। তবে ভরসা গাড়ী প্রায়ই বিলম্বে আসে।

এদিকে মনীশ ষ্টেশনে এসে গাড়ী বিলম্বের খবর পেয়ে ওয়েটিং রুমের এক কোণে আশ্রয় নেয়। উদ্দেশ্য যতক্ষণ গাড়ী না আসে,

ততক্ষণ হাতের বইখানাতে মনসংযোগ করা। বইয়ে মনোযোগের চেষ্টা করতেই চোখের পাতা দুটো ভারী হয়ে ওঠে। সঙ্গে-সঙ্গে সে হাতের উপর মাথা রেখে শুয়ে পড়ে।

যতীশ কাজ সেরে বাংলোয় ফিরে দেখে মনীশ তখনও ফেরে নি। তক্ষুনি সে ষ্টেশনের দিকে রওনা হয়। সঙ্গে নেয় ড্রাইভার ও একজন বেয়ারাকে।

ষ্টেশনে পৌঁছে যতীশ দেখে গাড়ী সবেমাত্র এসেছে। মেয়ে ও পুরুষ কুলির মধ্যে ইলাদের মালপত্র নিয়ে কাড়াকাড়ি আরম্ভ হয়েছে।

সাহেবকে দেখে তাদেব ঝগড়া বন্ধ হয়ে যায়। যতীশ ইলাকে চিনতে পারে না। বছর বারো আগে বিয়ের সময় একবার মাত্র দেখেছিল।

মৃণ্ময়ী পরিচয় করিয়ে দেন, এই ইলা।

যতীশ হেসে বলে, এখন লেডী ডাক্তার। চেনবার জো নেই। যেমনি মাথায় তেমনি...

সিপাই কুলিদের নির্দেশ দিয়ে সে আগে-আগে পা বাড়ায়।

যতীশ, মৃণ্ময়ী আর ইলা গাড়ীতে গিয়ে বসে। মৃণ্ময়ীকে মনীশের কথা জিজ্ঞেস করে.যতীশ।

উত্তরে মৃণ্ময়ী বলেন, কই দেখিনি তো! হয়ত আমাদের সে চিনতে পারেনি। আর আমিও তাকে দেখিনি আজ প্রায় বারো বছর হলো। সেই সুনন্দার বিয়ের সময় একবার দেখেছিলাম।

বাড়ীতে এসে যতীশ সুনন্দাকে জিজ্ঞেস করে মনীশের সম্বন্ধে।

তার প্রশ্ন শুনে সুনন্দা অবাক হয়ে যায়। না, এখনও তো সে আসে নি।

যতীশের মুখ দিয়ে একটা মন্তব্য বেরিয়ে আসে, 'রাবিশ'!

হঠাৎ একটা কুলির চীৎকারে মনীশের ঘুম ভেঙে যায়। সে তাকে জিজ্ঞেস করে গাড়ী এসেছে কিনা। কুলি উত্তর দেয়, গাড়ী এসেছে অনেকক্ষণ, এবং সওয়ারীরাও ষ্টেশন ছেড়ে চলে গিয়েছে।

কী সর্বনাশ। তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে মনীশ। সঙ্গে-সঙ্গে সে নিজেকে শত ধিক্কার দেয়। আজ কতই না সমালোচনার সম্মুখীন হতে হবে তাকে। সে প্রায় ছুটে চলে বাংলোর দিকে। বাংলোর কাছে এসে সে দেখে জীপগাড়ী দাঁড়িয়ে রয়েছে। পেছন দরজা দিয়ে সে নিঃশব্দে নিজের ঘরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ে।

রাত্রে ডাইনিং টেবিলে বসে যতীশ আবার খোঁজ করে মনীশের।

মনীশটা এখনও এল না?

সুনন্দা উত্তর দেয়, চিন্তার কথা বটে। যা আপনভোলা লোক হয়ত শিলিগুড়ি গিয়ে বসে আছে।

মৃণ্ময়ীও আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

একবার খবর নেওয়া দরকার। এই পাহাড়ে জঙ্গলে...

ইলাও চুপ করে থাকে না।

তিনি কখন বেরিয়েছেন?

অনেকক্ষণ। সংক্ষিপ্ত জবাব দেয় সুনন্দা।

ধীরে-ধীরে মনীশের প্রসঙ্গটাই মুখ্য আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠে। যতীশ হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

বিলেত থেকে ডি-ফিল হয়ে এসে হতভাগা যেন আরো নিরেট হয়ে গেছে। বুদ্ধি-শুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে। তারপর সুনন্দার দিকে তাকিয়ে বলে, ইনিই তাঁর দেওরটির মাথা খেয়েছেন। গুণী-মানী বলে সর্বক্ষণ স্তবস্তুতি করলে কি কারো মাথায় কিছু থাকে?

পাছে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা ঝগড়ার সৃষ্টি হয়, সেই আশঙ্কায় ইলা ঠাট্টা করে যতীশকে বলে, আপনি কিন্তু একবার হারিয়ে গিয়েছিলেন।

হারিয়ে গিয়েছিলাম, মানে ?

মানে, ১৯৩৯ থেকে ১৯৪২ সন পর্যন্ত আপনার কোন খবর পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ নিখোঁজ।

হোঃ হোঃ করে যতীশ সশব্দে হেসে ওঠে।

পাশের ঘরে কম্বলের নীচে শুয়ে প্রচণ্ড শীতেও মনীশ যেন ঘেমে ওঠে। অপরিচিত কুটুমের কাছে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করে দাদা যে কি তৃপ্তি পায়, তা' সে ভেবে পায় না। সব কটা কথাই তার কানে আসে।

টেবিলে বসে অবধি কারো যেন হাত সরছে না।

মৃণ্ময়ী বলেন, মনু আসুক, আরেকটু অপেক্ষা করে দেখা যাক।

প্রস্তাবটা ইলাও সমর্থন করে। কিন্তু সুনন্দা রাজী হয় না। জার্নিতে তোমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছ। তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে শুয়ে পড়। তার আসতে হয়ত আরো দেরী হবে। কোথায় গেছে কে জানে ?

কি একটা দরকারে বাবুর্চি মনীশের ঘরে এসে দেখে কে যেন কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে রয়েছে। মনীশ যে বাড়ী ফেরেনি একথা তার কানেও গিয়েছে। তাই সে আলোর সুইচ টেপে।

আওয়াজ দেয়, ছোট সাহেব !

মনীশ নির্জীবের মত পড়ে থাকে।

আবার ডাকে বাবুর্চি, ছোট সাহেব !

মনীশ ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ে। এমনি ভাব সে দেখায় যেন অনেকক্ষণ থেকে সে ঘুমিয়ে আছে।

বাবুর্চি ত্রস্তে এসে যতীশকে খবর দেয়, ছোট সাহেব নিজের কামরায় শুয়ে আছেন।

যতীশ গর্জে ওঠে, বুলাও উনকো।

বলা বাহুল্য মনীশ পোষাক বদলাবার অবসরটুকু পায়নি। সেই

ষ্টেশনে যাওয়ার পোষাকেই সে এসে হাজির হয়।

যতীশ একবার মনীশের মুখের উপর ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হানে। কি একটু ভেবে সে নিজের রাগটাকে সামলে নেয়।

তোমার জন্যে এরা সব বসে আছেন। তাড়াতাড়ি এসো।

মনীশ ভেবেছিল শরীর খারাপের অজুহাতে আপাততঃ ডাইনিং টেবিলে বসা থেকে রেহাই পাবে। কিন্তু তা হল না। মৃণ্ময়ীর অনুরোধে তাকে বাধ্য হয়েই বসতে হয়।

সুনন্দাই পরিচয় করিয়ে দেয় তাকে মৃণ্ময়ী ও ইলার সঙ্গে।

মৃণ্ময়ী বলেন, বারো বছর পরে মনীশকে সহজে চিনতে পারব বলে ভাবিনি, কিন্তু দেখছি, আমাদের সেই মনুই আছে। হঠাৎ দেখলে মনে হয় না, এতবড় একটা বিদ্যার জাহাজ, বিলাত-ফেরত। এমন ছেলেই তো চাই।

যতীশ মৃণ্ময়ীর দিকে তাকিয়ে বলে, মাসীমা এমন ছেলে কোন কাজে লাগে না। শুধু শুনতেই ভালো, বাস্তবের ঘাত-প্রতিঘাতে এরা বিধ্বস্ত হয়ে যায়। মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না। এখনকার সমাজ চায় এমন ছেলে যারা যুঝে দাঁড়াতে পারে।

সুনন্দার কানে বিশ্রী লাগে যতীশের কথাগুলো। সে বিরক্ত হয়ে ওঠে, তোমার সময়-অসময় জ্ঞান নেই।

ইলাও যতীশের বক্তৃতাকে বাড়তে দিতে চায় না।

বলে, মিঃ রে, এসব কথা এখন থাক।

মনীশের মনে ইলার প্রতি সশ্রদ্ধভাব ফুটে ওঠে। তার শিক্ষা ও রুচির উপর সে আস্থাবান হয়ে পড়ে। মনে-মনে অসংখ্য ধন্যবাদ জানায়।

মৃণ্ময়ী জানেন, তাঁর উপস্থিতিতে আর সকলের গাল্প-গল্প জমবে না। তাই তিনি সামান্য আহার সেরে উঠে পড়েন। এই সুযোগে মনীশও উঠে পড়ে।

সুনন্দা যতীশকে শুনিয়ে ইলাকে উদ্দেশ করে বলে, তুই হয়ত জানিসনে ওঁর মুখ বড় আলগা। রেখে-ঢেকে বলতে পারেন না। ভুল বুঝিসনে কিন্তু।

সোল্লাসে যতীশ চেঁচিয়ে ওঠে, বাঁচা গেল বাবা, তবে আমার সাতখুন মাপ।

চুপ কর, সুনন্দা ধমক দেয়। তারপর মন্তব্য করে সে, ভেবে পাইনে একটা জেলার শাসনের ভার এমন একজনের হাতে কি করে ছেড়ে দিয়েছেন সরকার।

যেমনি করে শ্বশুর মশাই তোমাকে ছেড়ে দিয়েছেন আমার হাতে। বলেই যতীশ মুখ টিপে হাসে।

আবার! চোখ ঘুরিয়ে ধমকে ওঠে সুনন্দা।

ইলা বলে, মিষ্টার রে'র দেখছি আগের স্বভাব এতটুকু বদলায়নি।

মানে?

আমার মনে আছে, আমাদের পেছু কিরকম লাগতেন, খামোকা চটাতেন। এখনও দেখছি দিদির...

ইলার মুখের অসমাপ্ত কথা কেড়ে নিয়ে যতীশ বলে বুঝলে না ঘোলের সাধ তেঁতুলে মেটানো হচ্ছে। তারপর নিজের রসিকতায় সে নিজেই সশব্দে হেসে ওঠে।

সুনন্দা মন্তব্য করে, এক ভাই যেমন সিরিয়াস, আর এক ভাই তেমনি হাল্কা।

অর্থাৎ সিরিও কমিক, বলেই ইলা নিজেও হেসে ফেলে।

ডাইনিং টেবিলে সাধারণতঃ যা হয়ে থাকে এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় না। অর্থাৎ খাওয়ার চেয়ে কথা হয় অনেক বেশী।

মনীশ ইচ্ছা করেই ইলাকে এড়িয়ে চলে। ইলা ভেবে পায় না,

উচ্চ শিক্ষিত বিলাত ফেরত যুবক কি করে এরকম মুখচোরা হল। সে বিদেশে কতরকম লোকের সঙ্গে মেলামেশা করেছে। মনের প্রসারতা আর দশজনের চাইতে বেশীই হওযা উচিত। কিন্তু তার আচরণ দেখলে মনে হয় সে যেন অষ্টাদশ শতাব্দীর সুবোধ ছেলের মন নিয়ে বিংশ শতাব্দীতে জন্মেছে। আশ্চর্য এই মানুষটি! দিদির মুখে ইলা শুনেছে মনীশেব পাণ্ডিত্যের কথা, সরস গল্পের কথা। কিন্তু আজ কদিনেব মধ্যে সে তার এতটুকু প্রমাণ পায়নি। নিশ্চয়ই সে বর্ণচোরা।

মাঝে-মাঝে ইলা মনীশের সম্বন্ধে তার অহেতুক কৌতূহলের কথা ভেবে মনে-মনে লজ্জা বোধ করে। মনীশের যতদূর পরিচয় সে পেয়েছে, তাতে এমন কোন বৈশিষ্ট্য তার চোখে পড়েনি যা কাউকে আকৃষ্ট করতে পাবে। তবে সে যে আপন-ভোলা নির্বিবাদী এ বিষয়ে আদৌ সন্দেহ নেই।

মনীশ নিজে জানে বাস্তবেব সঙ্গে যুঝতে গেলে যে কূট বুদ্ধিটুকুর প্রয়োজন, সে মূলধন তার নেই। এবং এই জন্যে সে বার কয়েক চবম আঘাতও পেয়েছে। মনে-মনে অসংখ্যবার ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে। এ ক্ষতেব বোঝা সে আব বাড়াতে চায় না। তার সরল ব্যবহারে অনেকেই হাসে, সুযোগ নেয়। পাণ্ডিত্যের অভিব্যক্তির অভাবে সে উচ্চ শিক্ষিত হয়েও মূর্খেব তুল্য। তদুপরি রূপহীন চেহারাটা তাকে আবো উপহাসেব পাত্র করে তুলেছে। তাই সে সমাজ থেকে একটু দুবে নেপথ্যে থাকতে চায়। লোকে তাকে বিদ্যার জাহাজ বলে সুখ্যাতি করে কিন্তু মর্যাদা দেয় না, সম্মান করে না, শুধু বিদ্রূপ করে।

সেদিন ডাইনিং টেবিলে খেতে বসে ইলা ঠাট্টা করে মনীশকে,

আচ্ছা বলুন তো, আমি বাঘ না ভালুক যে আমাকে দেখে ভয়ে পালিয়ে থাকেন। আমি এসে দেখছি আপনার চলা-ফেরার স্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট করে দিয়েছি।

সুনন্দা টিপ্পনী কাটে, মনীশ এ অত্যাধুনিক পরিবারে প্রাগৈতিহাসিক যুগের একটি জীবন্ত মডেল।

মনীশ আঘাতটা প্রথমে নীরবে সহ্য করে, তারপর নিজেকে একটু সামলে নেয়।

ভয় আপনাকে নয়, আপনাদের রসনাকে।

কথা ফুটেছে দেখছি। সুনন্দা ব্যঙ্গ করে। তারপর সে একটা কাজের ছুতোয় উঠে পড়ে।

ইলাকে উদ্দেশ করে বলে, তোরা গল্প কর, আমি এক্ষুণি আসছি।

মনীশ একটা সমস্যায় পড়ে যায় সসঙ্কোচে সে আড়ষ্ট হয়ে বসে। ইলার মনীশের অবস্থাটা বুঝতে বিলম্ব হয় না। আপনি এত সঙ্কোচ বোধ করছেন কেন?

কই না তো?

আচ্ছা বিলেতে মেয়ে-পুরুষের মধ্যে অবাধ মেলামেশা হয়। আপনাকেও নিশ্চয়ই মিশতে হয়েছে ক্লাশে, ক্লাবে। কিন্তু আপনার সঙ্কোচভাব দেখে বিশ্বাস হয় না।

তা হয়েছে। কিন্তু একটা কথা হচ্ছে এই যে তারা কখনও কারো দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে নিন্দে করে না। প্রশংসা করবার মত কিছু গুণ না থাকলেও খুঁচিয়ে দোষটুকুকে নিয়ে মাতামাতি করে না। কিন্তু আমাদের দেশে এটাকে রসিকতার নামে বেশ চালানো হয়। সত্যি কিনা বলুন?

আমি কি এমন কিছু বলেছি, যদি অজ্ঞাতসারে বলে থাকি তাহলে মাপ করবেন। আপনাকে আঘাত করার কিছু বলিনি, বিশ্বাস করুন।

ইলার দৃঢ় বিশ্বাস মনীশ নিশ্চয়ই কারো কাছ থেকে আঘাত পেয়েছে। তার প্রতি সমবেদনায় ইলার মনটা ভরে ওঠে। তাকে আর প্রশ্ন করে সে বিব্রত করতে চায় না।

মনীশের চোখে ইলাকে যেন ব্যতিক্রম, বিস্ময় বলে মনে হয়। সে এতদিন দেখে এসেছে কৃত্রিম সহানুভূতি দেখিয়ে বন্ধু-বান্ধবীগণ তার দুর্বলতার উপর ক্রমাগত আঘাত করে তাকে মুষড়ে-দুমড়ে দিয়েছে। কিন্তু ইলা তা করেনি। কাজেই তার প্রতি সশ্রদ্ধ ভাবটা দিনকে দিন তার বাড়তেই থাকে।

মৃণ্ময়ীর সঙ্গেও মাঝে-মাঝে কথাবার্তা হয় মনীশের। তার আদর্শ ও সুরুচির পরিচয় পেয়ে তিনি খুব খুশী হন। বর্তমান যুগে এমন একটি নিরভিমান উচ্চশিক্ষিত যুবক বিরল। তিনি প্রায়ই এ মন্তব্য করেন।

সুনন্দা লক্ষ্য করে, ইলা মনীশকে ঠাট্টা বিদ্রূপের হাত থেকে রক্ষা করতে চায়। অনেক সময় তার হয়ে ওকালতি করে। এতে সে মনে মনে খুশীই হয়। এই সহানুভূতিটুকু যদি অনুরাগে পরিণত হয় তাহলে মন্দের ভালো হয়। ইলার পক্ষপাতিত্বটুকু মৃণ্ময়ীর চোখেও পড়ে। তিনিও মনে-মনে অনেক কিছু কল্পনা করেন।

সুনন্দা মাঝে মাঝে ইলাকে ঠাট্টা করে। মনীশের প্রতি তার দুর্বলতার ইঙ্গিত দিয়ে খোঁচা দিতে চেষ্টা করে।

ইলা মনে মনে বলে, উল্টো বুঝলি রাম। কিন্তু প্রকাশ্যে সে কিছুই বলে না। শুধু নীরব হেসে সুনন্দার কথাগুলোর জবাব দেয়।

মাঝে-মাঝে সে নিজের সম্বন্ধে ভাবে। নিজের মনটাকে তলিয়ে দেখতে চেষ্টা করে, সুনন্দার কটাক্ষের সত্যতা পরখ করে দেখার জন্যে। দেখে তার অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে আরেকজনের সত্ত্বা ও প্রভাবে। সেখানে দ্বিতীয় ব্যক্তির ঠাঁই নেই। তবে

মনীশের সরল স্বভাব, অনাড়ম্বর জীবন ও চেহারাটাকে নিয়ে কেউ টিকা-টিপ্পনী কাটলে তার মনে লাগে। সে যখন দেখে মনীশের প্রাপ্য মর্যাদা দিতে তার আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব কুণ্ঠা বোধ করে, তখন তার অন্তরাত্মা যেন এই নিরীহ লোকটির জন্যে সহানুভূতিতে ভরে ওঠে। মানবতার এত বড় অপমান দেখে সে চুপ করে থাকতে পারে না। তাই সে কখনও-কখনও প্রতিবাদ জানায়। এর বেশী কিছু নয়।

মনীশ ভেবে পায় না, কারো প্রতি অনুকম্পা, সহানুভূতি দেখানোকে কদর্থ করতে মানুষ দ্বিধা বোধ করে না কেন? শিক্ষিত জগতে মানুষের একি বিকৃত রুচি। তারা সব কিছুর মধ্যেই স্বার্থের গন্ধ খুঁজে বেড়ায়। এসব কথা ভাবতে-ভাবতে তার মনটা সমাজের প্রতি বিষিয়ে ওঠে।

যতীশ সরকারী কাজে ব্যতিব্যস্ত থাকে। তার এতটুকু সময় নেই। কাজেই মৃণ্ময়ী ও ইলাকে দার্জিলিং শহরটা বেড়িয়ে আনার ভার পড়ে মনীশের উপর। মাঝে-মাঝে সুনন্দাও যায় তাদের সঙ্গে।

মৃণ্ময়ী প্রথম দু-একদিন বার হয়েছিলেন, শেষে বাতের ব্যথার অজুহাতে আর বেরুননি। কাজেই শেষ পর্যন্ত বেড়ানোটা মনীশ আর ইলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

বেড়াতে-বেড়াতে তাদেব মধ্যে অনেক কথাই হয়। তবে বিষয়বস্তুগুলি সামাজিক ও সাংসারিক আওতার বাইরে। অর্থাৎ রাজ-নৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থা ইত্যাদি।

ইলা মনীশের কথাবার্তায় এবং আলোচ্য বিষয়বস্তুর মধ্যে সুরুচি ও পরিপূর্ণ জ্ঞানের আভাষ পায়। এই আত্ম-প্রচারের যুগে

মনীশ কী করে আত্মসমাহিত হয়ে আছে, তা সে ভেবে অবাক হয়ে যায়। সে যতই ভাবে ততই তার শ্রদ্ধা-ভক্তি এই নিরভিমান শীর্ণ নিরীহ লোকটির প্রতি বেড়েই যায়।

মনীশও ইলার সাহচর্য পেয়ে আনন্দিত হয়। তার সুরুচিপূর্ণ আভিজাত্যে সে আকৃষ্ট হয়। তার মধ্যে আভিজাত্যের নামে দুর্নীতি নেই ;—আধুনিকতার নামে উচ্ছৃঙ্খলতা নেই। তার আচার-ব্যবহার পোষাক ও চেহারায় এমন একটা সাম্যভাব আছে যা অজ্ঞাতসারে তাকে আকৃষ্ট করে। মাঝে মাঝে ইলার মনে হয় মনীশ যেন অনেকখানি পিছিয়ে আছে। তার আচার-ব্যবহারে মনে হয় সে যেন বর্তমান জগতের ছোঁয়া থেকে নিজেকে বাঁচাতে সর্বদা যত্নবান, ঠিক শুচিবাই রোগীর মত।

মৃণ্ময়ীর বাতের ব্যথাটা দার্জিলিং এসে দিনকে দিন বাড়তেই থাকে। তাই তিনি ব্যস্ত হয়ে ওঠেন কোলকাতায় ফিরে যেতে। কিন্তু সুনন্দা ও যতীশের বিশেষ অনুরোধে তাঁর যাওয়া স্থগিত থাকে।

এদিকে মনীশের কলেজে অধ্যাপনার কাজে যোগ দেওয়ার দিন এগিয়ে আসে। মৃণ্ময়ী বলেন, বেশ আমরা তাহলে মনীশের সঙ্গেই রওনা হব।

এক্ষুনি কোলকাতার ঘিঞ্জি-পরিবেশের মধ্যে ফিরে যেতে ইলার মন চায় না। তাছাড়া সলিলকে ভুলে যাওয়ার জন্যেই সে দার্জিলিং এসেছে। হৈ-চৈ করে আমোদ-আহ্লাদের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে চেষ্টা করছে সে। কতকটা সফলও হয়েছে। তবে মাঝে মাঝে কোন মনোরম দৃশ্য ও আনন্দ একা উপভোগ করতে গিয়ে তার মনটা যেন মুষড়ে পড়ে। সলিলের অনুপস্থিতি সে তীব্রভাবে

অনুভব করে। কিন্তু প্রকাশ্যে সে এমন হাসিখুশী ভাব দেখায় যে বাইরের লোকের পক্ষে তার মানসিক অবস্থাটা আঁচ করা কঠিন।

মনীশ ইলার সঙ্গ পেয়ে অনেকটা অনুপ্রেরণা পায়। সে আগের চাইতে মুখর হয়ে ওঠে। এই পরিবর্তনটা যতীশ ও সুনন্দার চোখে পড়ে।

সুনন্দা একদিন ইলাকে প্রশংসা করে, তোর বাহাদুরি আছে ভাই, বোবার মুখে কথা ফুটিয়েছিস।

ইঙ্গিতটা বুঝতে ইলার বিলম্ব হয় না। সে উত্তর দেয়, ক্ষমতাকে অক্ষমতা বলে বিদ্রূপ করলে তার বিকাশ হয় না দিদি।

জহুরী জহর চেনে, কথাটা সত্যি। বলেই একটু মুচকি হেসে সুনন্দা কি একটা কাজের অজুহাতে উঠে পড়ে। কিন্তু ঐ হাসিটুকু ইলার মনে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। সে ভাবে আরো কিছুদিন থাকলে দিদি ও জামাইবাবুর ভুল ধারণাটা বদ্ধমূল হবে। হয়ত তাকে এর জন্যে মিথ্যে নাকাল হতে হবে। সবচেয়ে পীড়াদায়ক হবে যদি মনীশ নিজে তাকে ভুল বোঝে। সরল মনে সে আঘাত দিতে চায় না। তাই যত তাড়াতাড়ি পারা যায় ফিরে যাওয়াই ভালো।

আজ ক'দিন মৃণ্ময়ীর শরীরটা যেন ভেঙে পড়েছে। হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে একটু জ্বর হয়েছে। তিনি ইচ্ছে করেই ইলার কাছে তাঁর অসুস্থতার কথাটা চেপে যান। ইলার কিন্তু বুঝতে বিলম্ব হয় না।

ভর্ৎসনার সুরে সে বলে, তোমার যে জ্বর হয়েছে বলোনি কেন?

অমনি মাঝে মাঝে হয় বাতের ব্যামোটার দরুণ, এমনিতেই সেরে যাবে।

সুনন্দা বলে, মাসীমা ভুলে যান যে, তাঁর মেয়ে ডাক্তার। তার চোখকে ফাঁকি দেওয়া সহজ নয়।

মৃণ্ময়ী সুনন্দার কথায় হেসে ফেলেন, ওকে ডাক্তারি পড়ানোই ভুল হয়েছে। সব কিছুতেই কেবল খুঁত খুঁত। কথায় কথায় কেবল ওষুধ গেলাবে।

ইলা মার কথা শুনে হেসে ফেলে।

সুনন্দা ও ইলা মৃণ্ময়ীকে ধরে এনে খাটে শুইয়ে দেয়।

লেপটা গায়ের উপর চড়িয়ে দিয়ে সুনন্দা বলে, আর নড়াচড়া করো না যেন। আমি ডাঃ বিশ্বাসকে ডেকে পাঠাচ্ছি।

মৃণ্ময়ী বারণ করেন, ডাক্তার ডাকিসনে মা, এমনি সেরে যাবে।

তিনি ইলাকে সাক্ষী মানেন, জিজ্ঞেস কর ইলাকে, সত্যি কিনা?

ইলা মা'র কথায় সায় দেয় না। তবে মন্তব্য করে, একবার অসুখে পড়লে মা বেশ ভোগেন ও ভোগান।

তাই বুঝি? অভিমানে মৃণ্ময়ীর গলার স্বর যেন বুজে আসে। তিনি লেপ দিয়ে আপাদমস্তক ঢেকে পাশ ফিরে শুয়ে থাকেন।

যতীশ ইলাকে বলে, ডাক্তাররা আপনার লোকের চিকিৎসা করেনা জান তো, তাই ডাঃ বিশ্বাসকে ডাকা হয়েছে।

ইলা মাথা নেড়ে সমর্থন করে যতীশের মন্তব্যটা।

ডাঃ বিশ্বাস মৃণ্ময়ীকে পরীক্ষা করে বলেন, ঠাণ্ডা লেগে জ্বর হয়েছে, সাবধানে রাখবেন। ওষুধ লিখে দিয়ে তিনি জ্বরের চার্ট রাখবার নির্দেশ দিয়ে যান।

মৃণ্ময়ীর অসুস্থতাকে কেন্দ্র করে মনীশ ও ইলার দেখা-সাক্ষাৎ মেলা-মেশাটা আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে মৃণ্ময়ীর জ্বরটা নিউমোনিয়ায় রূপান্তরিত হয়।

রাত জেগে পালা করে সুনন্দা, ইলা ও মনীশ সেবা করে। তাদের ঐকান্তিক সেবা-যত্নের এবং ডাক্তার বিশ্বাসের সুচিকিৎসার

ফলে মৃণ্ময়ী সেরে ওঠেন। এবং ডাক্তারের পরামর্শে যত শীঘ্র সম্ভব তাকে কোলকাতায় নিয়ে যাওয়াই স্থির হয়'। এই পাহাড়ী ঠাণ্ডা আবহাওয়া তাঁর স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নয়।

মৃণ্ময়ীর উঠে বসতে প্রায় মাসটাক লাগে। তিনি সুনন্দাকে ডেকে একদিন বলেন, এবার আমায় ছেড়ে দে মা। তোদের বড্ড ভুগিয়েছি।

কি যে বলো মাসীমা, আমরা তোমাকে এনে বরং কষ্টে ফেলেছি। আরো কিছুদিন বিশ্রাম করে শরীরটাকে ভালো করে সারিয়ে যাও।

শেষ পর্যন্ত সুনন্দার অনুরোধ টেকে না।

মৃণ্ময়ীর তাগিদে যতীশ অগত্যা রেলের কামরা রিজার্ভ করে। স্থির হয় মনীশও সঙ্গে যাবে।

নির্দিষ্ট দিনে যতীশ ও সুনন্দা তিনজনকে ট্রেনে তুলে দেয়। ইলা একটা বিছানা পেতে মৃণ্ময়ীকে শুতে দেয়। মৃণ্ময়ী তাঁর ক্লান্ত রুগ্ন দেহটাকে বিছানায় এলিয়ে দেন।

ছোট্ট রেলেগাড়ী মন্থর ও সর্পিল ভঙ্গিতে চলে। চলার গতি থেকে তার তর্জন গর্জন অনেক বেশী।

ইলা মনীশকে উদ্দেশ করে বলে, শুনছেন তো, অসারের কি রকম তর্জন গর্জন!

মনীশ হেসে ফেলে। উত্তর দেয়, তর্জন গর্জন কিন্তু জীবনী শক্তির পরিচায়ক।

সব সময় তা নয়!

মনীশের ইচ্ছা ছিল, খানিকক্ষণ তর্কটা চালিয়ে যায়। কিন্তু মৃণ্ময়ীর অস্বস্তি ও অসুস্থতার কথা চিন্তা করে সে কথায় যতি টানে। কাজেই ট্রেনে আর বিশেষ কোন কথা হয় না।

পূর্ব ব্যবস্থামত মনীশ ইলাদের বাড়ীতেই ওঠে এবং পরদিন কলেজে যোগদান করে। সুবিধামত ভালো বোর্ডিং-এ সীট পেলেই সে চলে যাবে।

মৃণ্ময়ী বলেন, অত তাড়া কিসের ?

ইলা টিপ্পনী কাটে, বোধ হয় এখানে অসুবিধা হচ্ছে তাই।

হচ্ছেই তো। অতিরিক্ত যত্নে আমার আরামপ্রিয়তা বেড়েই যাচ্ছে। এতে আখেরে আমারই ক্ষতি হবে। জানেন তো, আরাম হারাম হ্যায় !

বেশ কথা শিখেছেন তো ?

ছাত্রহিসেবে নেহাৎ খারাপ ছিলাম না ! বলেই মনীশ হেসে ওঠে।

ইলাও না হেসে থাকতে পারে না।

মনীশ কোন পরিবারের আবেষ্টনীর মধ্যে বেশী দিন থাকেনি। ছাত্রজীবনের বেশীর ভাগ সে হোস্টেল বোর্ডিং-এ কাটিয়েছে। বিলাত থেকে ঘুরে এসে অল্প কিছুদিন মাত্র দাদা বৌদির সংসারে ছিল। সে-সংসার আর দশটা বাঙালী পরিবার থেকে আলাদা। বাবুর্চি, বেয়ারা, দরওয়ান ও চাপরাশীর সংখ্যা এবং প্রাধ. বেশী। তাই এই দুই সংসারের পার্থক্যটা বিশেষভাবে তার চোখে পড়ে। এখানে মৃণ্ময়ী ও ইলা ঝি-চাকরদের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকেন না। ফলে আহার ও যত্ন আত্তির মধ্যে তাদের একটা আন্তরিকতার স্পর্শ থাকে। এ জিনিষটা মনীশকে সত্যিই মুগ্ধ করে: পারিবারিক জীবনের স্বার্থকতাটা ধীরে ধীরে তার চোখে পড়ে।

ইলা একদিন মনীশকে বলে, সাত তাড়াতাড়ি করে যা-তা হোটেল বোর্ডিং-এ উঠবেন না যেন। ভালো করে খোঁজ-খবর নেবেন, নইলে আপনার মত লোককে পদে পদে ঠকতে হবে।

মনীশ হেসে বলে, ঠকে ঠকে এখন অনেকটা অভ্যস্ত হয়ে গেছি। আগের মত আর দুঃখ হয় না।

সেদিন কলেজ ছুটি। মনীশ সকালের জলখাবার খেয়েই বেরিয়ে পড়ে বোর্ডিং-এর খোঁজে। উদ্দেশ্য মীর্জাপুর ষ্ট্রীটে যাবে। সে সবে রাস্তায় বেরিয়েছে এমনি সময় একজন সুদর্শন যুবক এসে তাকে নমস্কার জানায় অনেকটা সাহেবী কায়দায়।

কয়েক মুহূর্ত বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকিয়ে মনীশ বলে, ঠিক চিনতে পারলাম না তো?

যুবক চাপা হেসে বলে, পারবেন, বিলক্ষণ চিনতে পারবেন, তবে ধীরে ধীরে। ইঙ্গিতে ইলাদের বাড়ীটা দেখিয়ে সে জিজ্ঞেস করে, কদিন আছেন ওখানে? ওরা কে হয় আপনার?

আমার মাসীমার বাড়ী।

চট করে জবাবটা দিয়ে মনীশ নিশ্চিন্ত হয়।

ওটাতো আমারও মাসীমার বাড়ী। মৃণ্ময়ী দেবী আমার মাসীমা। যুবক উত্তর দেয়।

মনীশ কেমন যেন হকচকিয়ে যায়।

যুবকটি সম্পর্কটা আরো ঘনিষ্ঠ করবার চেষ্টা করে, তাহলে সম্পর্কে আপনি আমার মাসতুতো ভাই হলেন। পরিচিত হয়ে খুসী হলাম। কি আশ্চর্য দেখুন, মাসতুতো ভাইদের মধ্যে আলাপ পরিচয় নেই। কতদিন হয়ত ট্রামে-বাসে সীট নিয়ে ঝগড়া হয়েছে!

খানিকটা পথ এগিয়ে আসার পর যুবকটি প্রস্তাব করে, আসুন না আমাদের বাড়ী। বেশ আলাপ পরিচয় হবে সবার সঙ্গে। মা দেখে খুসী হবেন।

আজ থাক আর একদিন। একটু বিশেষ কাজে বেরুচ্ছি।

মনীশ এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে। তার আশঙ্কা, মিথ্যা পরিচয় প্রকাশ হলে তাকে নাকাল হতে হবে।

একটা ভাড়াটে ট্যাক্সিকে পাশ কেটে এগিয়ে যেতে দেখেই যুবকটি হাত উঁচিয়ে থামায়। মনীশকে বলে, উঠে পড়ুন। মনীশ আপত্তি করবার সময়টুকু পর্যন্ত পায় না।

ট্যাক্সিতে উঠে যুবক নিজের পবিচয় দেয়। আমার নাম অনিমেষ সেন। সঙ্গে সঙ্গে সে সিগাবেটের কেসটা বাড়িয়ে দেয় মনীশের দিকে।

মনীশ ধন্যবাদ জানিয়ে বলে, অভ্যাস নেই।

এই বয়সেই সন্ন্যাসী! সশব্দে হেসে ওঠে অনিমেষ।

হাসিব রেশটুকু মনীশেব কানে বিষবৎ ঠেকে।

কয়েক মিনিটেব মধ্যেই ট্যাক্সি এসে নির্দিষ্ট বাড়ীর দরজায় পৌঁছে।

অনিমেষ আগে নেমে গিয়ে গাড়ীর দরজা খুলে দেয়। তারপর সশব্দে সিঁড়ি ভেঙ্গে মনীশকে নিযে সে দোতলায় ওঠে। ড্রইং রুমে এসে সে বলে, আপনি বসুন, আমি এক্ষুনি আসছি।

কয়েক মিনিট পরে ফিরে এসে সে বলে, সরি, মা-বাবা কেউ বাড়ী নেই। খানিক আগে বেরিয়েছেন মার্কেটিং-এ। আর একদিন আলাপ করিয়ে দেব'খন।

ততক্ষণে মনীশ ঘরেব আসবাবপত্র, ছবি, ফটো ইত্যাদির উপর চোখ বুলিয়ে নেয়' সে লক্ষ্য করে, সবকিছুর মধ্যেই একটা সুরুচি ও আর্থিক স্বচ্ছলতার ইঙ্গিত রয়েছে।

হঠাৎ সে উঠে দাঁড়ায়, বিদায় নিতে চায়, আজ আসি ভাই।

অনিমেষ তাকে হাত ধরে বসায়।

চা না খাইয়ে ভাইকে ছেড়ে দিতে আছে? বিশেষ করে প্রথম পরিচয়। মা শুনলে আমাকে যা-তাই বলবেন।

অগত্যা মনীশ বসে পড়ে। খানিকক্ষণ পর প্রচুর খাবার ও চা

নিয়ে একজন চাকর আসে। মনীশের কোন ওজর আপত্তি খাটে না। সবই খেতে হয় তাকে।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনিমেষ সব জেনে নেয়। ইলাদের সঙ্গে মনীশের আসল সম্পর্কটা। কোলকাতায় কি উদ্দেশ্যে আসা, কি করা হয় ইত্যাদি।

অনিমেষের আন্তরিকতা ও সরলতার মাধুর্যে মনীশ মুগ্ধ হয়। সে লুকোয় না এতটুকু। অকপটে সব বলে যায়। এমন কি মৃণ্ময়ী যে দার্জিলিং-এ অসুস্থ ছিলেন, সেই কথাটাও বাদ দেয় না। এবং তাঁর অসুস্থতার দরুণই তাকে সঙ্গে আসতে হয়েছে, তাও সে জানায়।

অনিমেষ প্রশ্ন করে, আমার বোনটিকে আপনার কেমন লাগে?

বেশ ভাল।

একটা খুসীর ভাব দেখিয়ে অনিমেষ হাসে। তারপর বলে, আচ্ছা, ইলা তো আপনার আপন মাসতুতো বোন নয়, তা হলে আপনার সঙ্গে তার বিয়ের সম্বন্ধ চলতে পারে। মাসীমা একজন ভাল ছেলে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। আপনি রাজী হলে আমি .

এই অভাবিত প্রস্তাবে প্রথমটা মনীশ অবাক হয়ে যায়। পরে সে মনে করে বোনের জন্য ভাইয়ের উৎকণ্ঠা থাকা স্বাভাবিক। কি একটু ভেবে নিয়ে সে বলে, শুনছি আপনার বোন বিয়ে করবেন না। ডাক্তারি প্র্যাকটিশ করবেন।

কৃত্রিম উৎসাহ দেখিয়ে অনিমেষ বলে, তাহলে দেখছি আপনার সঙ্গে অনেক কথাই হয়েছে।

সে ভ্রূ কুঁচকে তাকায় মনীশের দিকে।

মনীশ ত্রস্তে উঠে পড়ে বলে, আজ আসি।

অনিমেষ এবার তাকে আর বাধা দেয় না। একটা ক্রূর হাসি হেসে মনীশকে সে বিদায় দেয়। ভদ্রতার খাতিরে বড় রাস্তা অবধি এগিয়ে দেয়।

মনীশ পথে নেমে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। তার আর বোর্ডিং খোঁজা হয় না। সে যে এত সহজে অনিমেষের কাছ থেকে ছাড়া পাবে, তা সে ভাবতেও পারে নি। খানিক পূর্বে অনিমেষেব মুখে যে অদ্ভুত হাসি দেখেছে তা' সে ভুলতে পারে না। কী ভয়ঙ্কর ক্রূর হাসি।

বাড়ী ফিবতেই ইলা প্রশ্ন করে, কদ্দূর গিয়েছিলেন? অত দেরী হল যে?

বেশী দূব নয়।

বিশ্রাম করে চানটা সেরে নিন। আপনার জন্যে ভেবে ভেবে আমরা সারা হচ্ছি। অত দেরী তো কোনদিন হয় না।

ছিঃ ছিঃ, আমাব জন্যে এতক্ষণ না খেযে বসে থাকা আপনাদেব ঠিক হয়নি। সত্যিই আমি খুব দুঃখিত।

মুখে একথা বললেও মনীশ মনে মনে একটা তৃপ্তি বোধ করে। তার জন্যেও লোকে ভাবে, অপেক্ষা করে।

বিশ্রাম না করেই সে জামা জুতো ছেড়ে তোয়ালে কাঁধে করে বাথরুমে ঢোকে।

ইলা নিজের হাতে খাবারগুলো গুছিয়ে রাখে টেবিলের উপর বেশ পরিপাটি করে। প্রত্যেকটা আযোজন তর-তম করে। নিজের জন্যে অপেক্ষাকৃত কম অংশটা রেখে বেশীব ভাগটা মনীশের ডিসে তুলে দেয় সে।

মনীশ চান সেরে ডাইনিং রুমে এসে দেখে সব তৈরি। তাড়াতাড়ির মধ্যে চুলটা পর্যন্ত সে পাট কবতে ভুলে যায়।

ইলা হেসে বলে, ছেলের বিয়ে না মেয়ের বিয়ে? মাথার চুল পর্যন্ত পাট করার সময় নেই?

মনীশ হেসে উত্তর দেয়, আগে নিজের হোক। তারপর ছেলে-মেয়ের কথা হবে।

দেখছি কোলকাতার হাওযা আপনার দার্জিলিং-এর জড়তা দূর করেছে।

হয়ত হবে।

এমন সময় মৃণ্ময়ী ডাইনিং রুমে আসেন। মনীশকে উদ্দেশ করে প্রশ্ন কবেন, অত দেবী কেন হল বাবা! কোলকাতার পথ-ঘাট, ফিরতে দেরী হলে নানা আশঙ্কা হয়।

মনীশ আসল কথাটা প্রথমে চেপে যায।

এই একটু ঘুবে বেড়িয়ে এলুম। ছুটিব দিন কিনা তাই।

খেতে বসে সে আমতা আমতা কবে বলে, আজ কিন্তু অত সব খেতে পারব না।

অনুযোগেব সুবে মৃণ্ময়ী বলেন, কেন হোটেল-বেষ্টুবেণ্টে খেয়ে এসেছ বুঝি! ওসব তোমাব সহ্য হবে না। তাছাড়া

মনীশ হেসে মৃণ্ময়ীব দিকে তাকিয়ে জবাব দেয, হোটেল রেষ্টুরেণ্টে নয় অন্য জাযগায়। আস্তে আস্তে মনীশ তাব অভিযানের কথা বলে। বেরিয়েই অনিমেষেব সঙ্গে দেখা, তাবপব তাব বাড়ী যাওয়া, চা খাওযা, ইত্যাদি।

মৃণ্ময়ী শুনে অবাক হযে যান। বলেন, আমাব অনিমেষ নামে কোন বোনপো আছে বলে মনে পড়ছে না তো। দিদির তো কোন ছেলে ছিল না। সুনন্দাই তার একমাত্র সন্তান। অনিমেষ বাবু নিশ্চয়ই তোমাকে ভুল করে তার বাড়ী নিয়ে গিয়েছেন বাবা।

ইলা ডিস থেকে হাত উঠিয়ে নিয়ে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। রহস্যটা সে তলিয়ে দেখতে চেষ্টা করে। থেকে থেকে তার মনে একটা সন্দেহ উঁকি-ঝুঁকি দেয়। কিন্তু প্রকাশ্যে সে শুধু বলে, হয়ত দূর-সম্পর্কের কেউ হবে।

মনীশ জোর দিয়ে বলে, না দুর সম্পর্কের কেউ নয়। অনিমেষ বাবুর কথা শুনে মনে হল, এ বাড়ীর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

শেষে অনিমেষের চেহারার এবং আদব কায়দার বিবরণ শুনে ইলা নিশ্চিত ধরে নেয়, এ সেই পাষণ্ড ছাড়া আর কেউ নয়। কিন্তু প্রকাশ্যে সে তাব ধারণাটা প্রকাশ করে না। মনীশকে অনুযোগের স্বরে বলে, বাবে! বসে আছেন কেন, খান।

আমি তো ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারছি নে।

এর মধ্যে বোঝাবুঝিব কী আছে? নিশ্চয়ই কোন আত্মীয় হবে।

বিস্ময়টাকে হাল্কা করতে চেষ্টা কবে ইলা।

মনীশ ও ইলার মধ্যে অন্যান্য দিনেব মত আজ আর গল্প জমে না। মনীশ ভাবে কোথায যেন কী একটা গোলমাল হয়ে গেছে এবং তাব জন্যে সেই দাযী।

মৃণ্ময়ী মনীশকে সাবধান করে দেন, ঠগ জোচ্চোরেব অভাব নেই এখানে। অপরিচিতের সঙ্গে কথা না বলাই ভালো।

মনীশকে বিদায় কবে দিয়ে খালি ঘরে অলক একা-একা খানিকক্ষণ পাইচারি করে। মনীশের চেহাবা ও হাবভাব দেখে প্রথম থেকেই তার হাসি পাচ্ছিল। কোন রকমে সে হাসিটা চেপে রেখেছিল। এই আনইম্প্রেসিভ শীর্ণ চেহারার লোকটা ইলার মন জয় করতে পারবে বলে সে বিশ্বাস করে না। তবুও নিঃসন্দেহ হবার জন্যেই সে বিয়ের ইঙ্গিতটা দেয়। লোকটার পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে তার কোন দ্বিধা নেই কিন্তু সে যে নিতান্ত আপন ভোলা, গো-বেচারা এ বিষয়েও তার সন্দেহ নেই। তাকে তার

প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে ভাবতেও হাসি পায়। এই লোকটিকে কেন্দ্র করে সলিল ও ইলার মধ্যে ভুল বোঝাবুঝিটা গড়ে তোলা শক্ত হবে না। এমনি একটা সুযোগ সে এতদিন হাতড়ে বেড়াচ্ছিল। বাঁ হাতের উপর ডান হাত দিয়ে ঘুষি মেরে সে সানন্দে স্বগতঃ বলে, ঠিক আছে, যা' চেয়েছিলাম তা' পেয়েছি।

কোন রকমে খাওয়া শেষ করে মনীশ নিজের ঘরে ফিরে আসে। সে ভাবে হঠাৎ ইলার মুখের চেহারাটা বদলে গেল কেন? সে কি তার মনে কোন আঘাত দিয়েছে! এক একবার ভাবে সে এ বিষয়ে ইলাকে স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করবে। কিন্তু ইচ্ছে সত্ত্বেও সরাসরি জিজ্ঞাসা করতে পারে না। কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ করে সে।

ইলা খানিকক্ষণ পর নিজের ঘরে ফিরে আসে। মৃণ্ময়ী এসে বসেন তার কাছে। প্রশ্ন করেন, কিছুই খাস নি কেন, শরীর খারাপ হয়নি তো?

না। উত্তর দেয় ইলা।

মৃণ্ময়ী লক্ষ্য করেন ইলার অপ্রসন্ন ভাবটা। কিন্তু কারণটা ঠিক তিনি বুঝে উঠতে পারেন না। তবে মনীশের বাইরে থেকে ফেরার পর এবং কে একজন অনিমেষের কথা উঠার পর থেকেই তিনি মেয়ের চেহারার পরিবর্তনটা লক্ষ্য করেন।

হঠাৎ ইলা মৃণ্ময়ীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, মা, ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পারছো?

তিনি প্রশ্নের তাৎপর্যটা বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ ইলার দিকে তাকিয়ে থাকেন। ইলা জানে তার মা কত সরল। কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তলিয়ে কোন কালেই তিনি দেখেন না। ফলে দুর্ভোগও কম হয় না। সে এ জন্য মাকে কোন

দিন অনুযোগও করেনি। কিন্তু আজ তার ব্যতিক্রম ঘটে। হঠাৎ সে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

তোমার আস্কারাতেই অলক অতখানি সাহস পেয়েছে।

ব্যাপারটা কি বুঝিয়ে বল।

আর বলব কি? মনীশবাবু যে অনিমেষের কথা বলেছে, সে যে কে তা তুমি বুঝতে না পারলেও আমি পেরেছি। অলক যে কত বড় শয়তান তা তুমি জান না। সে আমার প্রতি প্রতিশোধ নেওয়ার ফিকিরে আছে।

সে কেন এমন করবে, তা' বুঝতে পারছিনে তো?

তুমি বুঝতে চাও না তাই পারছো না।

ক্ষোভে দুঃখে ভেঙে পড়ে ইলা।

মৃণ্ময়ী ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞেস করেন, কী হয়েছে আমাকে খুলে বল।

ইলা আস্তে আস্তে বলে তার কলেজ জীবনের কথা। অলকের চক্রান্তের কথা, স্বার্থের কথা।

মৃণ্ময়ী ইলার মুখে সমস্ত শুনে হতভম্ব হয়ে যান! একটা শিক্ষিত ভদ্র সন্তান কেমন করে অত ছোট নীচ হতে পারে তা' তিনি ভেবে পান না। তাদেরই উপর এই সমাজ ও দেশের ভার। তিনি মনে মনে স্থির করেন, আর কাউকে কখনও স্নেহ করবেন না, প্রশ্রয় দেবেন না। তার ভালো মানুষীর সুযোগ নিয়ে সবাই আঘাত করে। আজ মেয়ের কাছে তিনি স্বীকার করেন যে সত্যিই তিনি লোক চেনেন না। এমন কি সলিলকেও তিনি চিনতে পারেন নি।

তাই তিনি ইলাকে স্পষ্ট নির্দেশ দেন, মনীশকে বলে দে, অন্য কোথাও সে চলে যাক। আজকালকার শিক্ষিত ছেলেদের বোঝা বড় কঠিন।

ইলা ভাবতে পারেনি মার রাগটা হঠাৎ গিয়ে মনীশের উপর পড়বে। সে নিম্ন কণ্ঠে বলে, মা চুপ কর। মনীশবাবু পাশের ঘরে আছেন, শুনতে পেলে মনে দুঃখ পাবেন।

আমাকে যে লোক অপমান করে, ব্যথা দেয় তা'তে বুঝি আমার দুঃখ কষ্ট হয় না।

আজ ইলা ডাঃ সেনের চক্রান্তের কথাও বাদ দেয় না। অলকের স্বরূপটাও মার কাছে প্রকাশ করতে পেরে সে সত্যি নিজেকে অনেকটা হাল্কা বোধ করে।

মনীশ দুপুরের নিদ্রা থেকে উঠেই লক্ষ্য করে বাড়ীর থমথমে ভাবটা। বিশেষ করে মৃণ্ময়ীর চেহারাটা যেন এক দুপুরের মধ্যেই বদলে গেছে। সেই মাতৃস্নেহভরা সহাস্য মুখখানা যেন আর নেই। তার বদলে অস্বাভাবিক কাঠিন্য ভাব ফুটে উঠেছে তার চোখে-মুখে।

মনীশের মনে কেমন একটা খটকা লাগে। হয়ত অজান্তে সে তাদের মনে আঘাত দিয়েছে। নয়ত তার উড়ে এসে জুড়ে বসাটা ঠিক হয় নি। অনেক ভেবে চিন্তেও এই 'হয়ত' 'নয়ত'র সমাধান সে করতে পারে না। তাই সে ইলাকে একা পেয়ে জিজ্ঞেস করে, হঠাৎ মাসীমা এত গম্ভীর হয়ে গেলেন কেন ?

আপনি পালাই পালাই করছেন কিনা তাই।

মনীশের কিন্তু ইলার উত্তরটা মনঃপূত হয় না। ইলা আড়চোখে দেখে নেয় মনীশের মুখের পরিবর্তনটা।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে মনীশ বলে, আমি যখন আপনাদের অসন্তুষ্টির কারণ, তখন আমার আর এ বাড়ীতে থাকা চলে না।

তাই বুঝি ? কপট দুষ্টুমির হাসি হাসে ইলা।

আমি কালই চলে যাচ্ছি। তবে যাবার আগে মাসীমার ও আপনার অসন্তুষ্টির কারণটা জানতে পারলে খুসী হতাম্।

মার অসন্তুষ্টির কারণটা তো বললুম।

সত্যি বলছেন? একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মনীশ বলে, আঃ বাঁচলাম। এদিকে কত কিছু ভেবে আমি সারা হচ্ছি।

যথা?

বারে! আপনি দেখছি এই ব্যক্তি স্বাধীনতার যুগে আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করতে চান। মনীশ যে এমনভাবে তাকে খোঁচা দেবে, তা' ইলা ভাবতেও পারে নি।

বেশ কথা শিখেছেন তো?

যা' শেখান তা' মনে রাখতে পারি কৈ?

ইলা যেন আর উত্তর খুঁজে পায় না। চুপ করে থাকলে হঠাৎ খাপছাড়া দেখায় তাই সে বলে, তাহলে বলুন, আমাকে গুরু বলে মেনে নিলেন। এখন থেকে যা' বলব শুনতে হবে কিন্তু।

মনীশ যেন আজ নতুন প্রেরণায় মুখর হয়ে ওঠে। সে ব্যাকরণটা শুদ্ধ করে দেয়, গুরু নয়, গুর্বী বলুন।

আপনি আমার চাইতে বিদ্যায়, বুদ্ধিতে অনেক বড়। কাজেই আপনার কাছে বিদ্যায় হারলে আমার লজ্জার কোন কারণ নেই।

মনীশ ইলার এই কথায় সঙ্কোচ বোধ করে। ইলা হয়ত ভাবছে সে তার পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতে গিয়ে তাকে আঘাত করেছে। কিন্তু সত্যি তা' নয়।

মনীশ বলে, আশা করি, আমাকে ভুল বুঝবেন না। ঠাট্টা করেছি মাত্র।

ইলা হেসে বিষয়ান্তরের অবতারণা করে, চলুন, আজ একটু বেড়িয়ে আসি।

এ প্রস্তাবে মনীশ খুসী হয়েই সম্মতি দেয়।

সন্ধ্যার পর তারা দুজনে বেরিয়ে পড়ে। ইলা ইচ্ছে করেই অলকদের বাড়ীর পথটা ধরে চলে। গল্প করতে করতে তারা পথটা অতিক্রম করে। বেশ খানিকটা পথ হেঁটে এসে ইলা আঙুলের নির্দেশে গোলপার্কের অদূরে একটা তেতলা বাড়ী দেখিয়ে জিজ্ঞেস করে, বলুন তো এই সেই বাড়ী কিনা যেখানে অনিমেষ আপনাকে নিয়ে এসেছিল।

মনীশ স্বীকার করে, হ্যাঁ এই সেই বাড়ী।

কিন্তু সে অবাক হয়ে যায়। ইলা কি করে বাড়ীটা চিনতে পারলে। সে তাকে বাড়ীর রাস্তার নাম, চেহারা কিছুই বলেনি। কাজেই অনিমেষ যে ইলার নিকট-আত্মীয়, বিশেষ পরিচিত, এ বিষয়ে তার আর সন্দেহ থাকে না।

গোল পার্কের পাশ ঘেঁষে যে রাস্তাটা লেকে গিয়ে পড়েছে সেই পথটা ধরে ইলা ও মনীশ এগিয়ে যায়। লেকে এসে তারা একটা অপেক্ষাকৃত নিরিবিলি জায়গা বেছে নেয়।

মনীশ বলে, আপনি তো বেশ হাঁটতে পারেন দেখছি। অতখানি পথ বেশ অবলীলাক্রমে হেঁটে এলেন। আমি তো প্রায় হাঁপিয়ে উঠেছি।

আমার হেঁটে চলতেই ভালো লাগে। যতটা সম্ভব গাড়ী চড়া এড়িয়ে যাই।

এমনসময় অলক লেকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ মনীশের কথাটা কানে যেতেই সে থমকে দাঁড়ায়। কণ্ঠস্বরটা যেন পরিচিত বলে মনে হয়। তাই ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই তার চোখে পড়ে, মনীশ আর ইলা পাশাপাশি বসে। সে ভাবে হঠাৎ দেখা দিয়ে তাদের অবাক করে দেবে। কয়েক পা বাঁ দিকে এগিয়ে গিয়ে সে হঠাৎ নাটকীয় ভঙ্গীতে চেঁচিয়ে বলে ওঠে, আরে ইলা যে?

ইলা হতভম্ব হয়ে যায় অলককে দেখে। তার সন্দেহ হয় তাদের এদিকে আসতে দেখে নিশ্চয়ই সে পিছু নিয়েছে। সঙ্গে

সঙ্গে অলকের প্রতি তার সুপ্ত ঘৃণার ভাবটা আবার চাড়া দিয়ে ওঠে। বিরক্তিপূর্ণ ও ঘৃণার দৃষ্টিতে সে তাকায় তার দিকে।

অলক লক্ষ্য করে ইলার অপ্রসন্নভাবটা। পাছে মনীশ তাকে উল্টো বোঝে সেই আশঙ্কায় সে পরিবেশটাকে সহজ করে তুলতে চেষ্টা করে।

ইলাকে কুশল জিজ্ঞেস করে, তোমরা সব ভাল তো? মাসীমা কি রকম আছেন? কবে এলে দার্জিলিং থেকে?

বিদ্রূপের হাসি হেসে ইলা উত্তর দেয়, বেশ ভাল অভিনয় করতে পার বটে!

মানে?

ইলার কণ্ঠস্বরটা কঠিন হয়ে ওঠে।

সে ইঙ্গিতে মনীশকে দেখিয়ে বলে, এঁকে নিশ্চয়ই চেন?

মনীশ আগ্রহের সঙ্গে বলে, এই যে সেদিন...

আপনি চুপ করুন। ইলা ধমকের সুরে বলে, মনীশকে।

মনীশ বিষয়ের গুরুত্বটা বুঝতে না পেরে চুপ করে থাকে।

অলক আমতা আমতা করে বলে, কোথাও যেন...

রাগে ফেটে পড়ে ইলা।

মিথ্যাবাদী, নীচ হীন। সেদিন এই ভদ্রলোককে মিথ্যা পরিচয় দিয়ে নিজের নাম ভাঁড়িয়ে বাড়ী নিয়ে যাওনি? মিষ্টি কথায় তার কাছ থেকে খবরাখবর আদায় করনি? আর এখন চিনতেই পারছো না! স্কাউণ্ড্রেল!

ঘৃণায় ইলার নাকটা আবার কুঁচকে ওঠে।

মনীশ যেন আকাশ থেকে পড়ে। সে ভাবতেই পারেনি এসব। অলককে সে সম্পূর্ণ বিশ্বাসই করেছিল এবং সেইজন্যেই সে তার প্রশ্নের যথাযথ জবাব দিয়েছিল। সে যে কী মারাত্মক ভুল

করেছিল সেদিন তা' মনে হলে এখন তার গা যেন কাঁটা দিয়ে ওঠে।

অলক বোঝে, সে তার চালে ভুল করেছে। মনীশের সম্মুখে সে আজ নাকাল হয়েছে নিতান্ত বুদ্ধির দোষে। পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়াই তার উচিত ছিল। সে ভাবতেও পারেনি মনীশের সম্মুখে ইলা একটা সীন করে ফেলবে!

প্রথমে সে হতভম্ব হয়ে যায়। তারপর অপমানটাকে নীরবে হজম করে সে ইলাকে উদ্দেশ করে বলে, নিশ্চয়ই তোমার মনটা ভাল নেই। নইলে তোমাকে এমন আপসেট হতে এর আগে কখনও দেখিনি! অবশ্য এমন পরিস্থিতিতে পড়লে মাথা ঠিক না থাকারই কথা। আই পিটি ইউ! গুড নাইট।

সাহেবী কায়দায় অভিবাদন জানিয়ে সে লম্বা লম্বা পা ফেলে বড় রাস্তার দিকে এগিয়ে যায়।

অলক দৃষ্টির বাইরে চলে যেতেই মনীশ স্বগত বলে, ওঃ কী সাংঘাতিক লোক।

তার উক্তি সমর্থন করে ইলা।

মন্তব্য করে, সাপের চেয়েও ভয়ঙ্কর।

পথ চলতে চলতে অলক স্থির করে, ইলার প্রতি প্রতিশোধ সে নেবেই। আর কিছু পারুক বা না পারুক সে তাব জীবনটাকে বিষিয়ে দেবার চেষ্টা করবে। সে যে একটা বাজে মেয়ে তা' সে প্রমাণ করবে তার বন্ধুদের কাছে। তাদের ভুল ধারণাটা ভেঙে দেবে, কলা-কৌশলে যে ভাবেই হোক, বিশেষ করে সলিলের কাছে, যার সঙ্গে ইলার বন্ধুত্ব বেশী।

অলক নিশ্চিত জানে সলিল কৈলিকে বিয়ে করেছে অনিচ্ছা-

সত্ত্বে। তার জীবনে ইলার প্রভাব এখনও রয়েছে পুরোমাত্রায়। তথ্যটা সে গোপনে সংগ্রহ করেছে। ইলার প্রতি যে তার বিশ্বাসটুকু আছে তা' নির্মূল করার অপূর্ব সুযোগ এসেছে এখন।

ইলাকে ভুল বুঝলে সলিল নিশ্চয়ই তার বিপদে আর সাড়া দেবে না। সলিল সরে গেলে ইলাকে তার কবল থেকে আর কেউ রক্ষা করতে পারবে না।

মনীশ! সে তার কাছে শিশু। এক ফুৎকারে উড়ে যাবে সে।
তারপর দেখে নেবে সে সুন্দরী, গর্বিতা ইলাকে!

এমন সময় সলিলকে এদিকে আসতে দেখে অলক চেঁচিয়ে ওঠে, হ্যালো, সলিল, কদ্দূর?

লেকের দিকে।

এত সহজে যে অলক সলিলকে হাতের কাছে পেয়ে যাবে তা' সে কল্পনাও করতে পারেনি। বিশেষ করে এই শুভ মুহূর্তে, প্রয়োজনের সময়। এখনও হয়ত ইলা আর মনীশ বসে আছে। সলিলকে এই দৃশ্যটা দেখিয়ে তাব আস্থা ফিরিয়ে আনার অপূর্ব সুযোগ।

কথায় কথায় অলক সেই দৃশ্যটির কাছাকাছি এসে দাঁড়ায়। সলিলকে প্রশ্ন করে, ইলার সঙ্গে দেখা হয়?

অলকের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সলিল বলে, কোথাও বসলে হয়।

প্রশ্নের উত্তরটা এড়িয়ে যেতে দেখে অলক যেন বেপরোয়া হয়ে ওঠে।

সে বলে যায়, ইলা প্রায়ই আসে লেকে বেড়াতে তার এক বন্ধুর সঙ্গে। নতুন বন্ধু, মনীশ রায়। আমদানী হয়েছে দার্জিলিং থেকে। দেখতে যেন ঠিক যশুরে কই। তবে পণ্ডিত লোক, ডি-ফিল।

কথার ফাঁকে ফাঁকে সে লক্ষ্য করে সলিলের মুখের পরিবর্তনটা।

সলিল কৌতূহলটা দমন করতে চেষ্টা করে। এক একবার সে ভাবে ধমক দিয়ে থামিয়ে দেবে অলককে। কিন্তু শেষপর্যন্ত পারে না। ঘন ঘন উঁকিঝুঁকি মেরে কৌতূহলটা তাকে যেন ব্যতিব্যস্ত করে তোলে।

সুযোগ বুঝে অলক আরো বলে, শুনছি, যণ্ডরে কইটার সঙ্গেই নাকি ইলার বিয়ে স্থির। ওদের বাড়ীতেই আস্তানা গেড়েছে লোকটা।

সলিল হেসে বলে, আজে বাজে খবর পরিবেশন করতে তোমার জুড়ি মেলে না।

আজে বাজে নয়, ওই দেখ, বলে আঙুলের সঙ্কেতে অলক দেখিয়ে দেয় ইলা আর মনীশকে। সঙ্গে সঙ্গে সে আবৃত্তি করে বলে, 'কপোত কপোতী যথা...'

সলিল ধমক দিতে গিয়েও থেমে যায়। তার দৃষ্টিটা গিয়ে পড়ে, অদূরে উপবিষ্টা ইলা ও তার নবাগত বন্ধুর উপর।

সলিলকে শুনিয়ে অলক মহাজন বাক্যটা ঝালিয়ে নেয়, 'বিশ্বাস নৈব কর্তব্যং স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ'। নিজেই প্রশংসা করে উক্তিটার। দিন রাত্রি যেমন সত্যি কথাটি ঠিক সেইরকম সত্যি।

সলিলের মনে একটা চাপা ঈর্ষা ক্ষণিকের জন্যে খেলে যায় বটে, কিন্তু প্রকাশ্যে সে অলককে বলে, বন্ধু-বান্ধবী একসঙ্গে বেড়াবে, গল্প করবে এটা স্বাভাবিক। একে কদর্থ করার কোন মানে হয় না। যারা কদর্থ করে তারা তাদের নিজের ছোট মনের ও অনুদারতার পরিচয় দেয়।

অলক বোঝে, সলিলের এই অনুযোগের মধ্যে উষ্মা নেই, তাপ নেই, আছে শুধু একটা চাপা ঈর্ষা, অভিমান। মনে মনে সে হাসে।

প্রকাশ্যে বলে, অন্ততঃ ইলার মত মেয়ের কাছ থেকে এটুকু আশা করিনি।

অলকের বাড়াবাড়িটা আর যেন সহ্য করতে পারে না সলিল। সে ধমক দিয়ে থামিয়ে দেয় তাকে।

সলিল যদি তাকে দু'ঘা বসিয়ে দেয় তাহলেও সে আজ কিছু বলবে না, কারণ তার উদ্দেশ্য হাসিল হয়েছে। সলিলের মনে ইলার প্রতি বিতৃষ্ণার ভাবটা সে জাগিয়ে তুলতে পেরেছে।

সলিল বাড়ী ফেরে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে।

মনীশ তার ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বলে, নটা বেজেছে, এখন ওঠা যাক।

সে ও ইলা রাস্তায় নেমে একটা ট্যাক্সি ডাকে। গাড়ীতে বসে সে ভাবে, এ কী হল! আজকের সন্ধ্যাটা এমনভাবে নষ্ট হবে তা' কল্পনাও করতে পারেনি। নিজেকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে সে, তার পক্ষে এ নতুন নয়।

ইলা তার কপালের দুপাশের রগ টিপে ধরে। যেন মাথার যন্ত্রণাটা বেড়েই যাচ্ছে। তার চোখেমুখে ক্লান্তির ছাপ পড়েছে।

পরদিন মনীশ তার সমস্ত শরীরে যন্ত্রণা অনুভব করে। সে চেষ্টা করে তার অসুস্থতার কথা গোপন রাখতে। কিন্তু পারে না। ইলা টেলিফোনে ডাঃ পালিতকে কল দেয়। তিনি তাদের পারিবারিক চিকিৎসক। ডাঃ পালিত মনীশকে পরীক্ষা করে বলেন, চিন্তার কোন কারণ নেই। সাধারণ জ্বর, ওষুধ লিখে দিয়ে তিনি উঠে পড়েন। যাবার সময় ইলাকে বলেন, এতো তুমি নিজেই চিকিৎসা করতে পার। সাধারণ জ্বর ছাড়া আর কিছু নয়।

চিকিৎসার ভার না নিলেও তদারক ও সেবা শুশ্রূষার ভার ইলাকে নিতে হয়।

মনীশ শিশুর মত অস্থির হয়ে পড়ে। মাথায় জল চাই, বরফ চাই, দার্জিলিং-এ দাদা-বৌদির কাছে তার পাঠানো হোক। ইত্যাদি নানারকমের বায়না করে সে।

অসুস্থ মনীশ ধীরে ধীরে ইলার প্রায় সবটুকু সময় কেড়ে নেয়। ইলা প্রাণপণ চেষ্টা করে তাকে সারিয়ে তুলতে।

মৃণ্ময়ী ভেবে অস্থির হন। যদি ভাল-মন্দ কিছু একটা হয়, তাহলে তার অনুশোচনার অন্ত থাকবে না। তিনিও মনীশেব কথায সায় দেন। ইলাকে বলেন, একটা তার করে দে দার্জিলিং-এ।

ইলা মার যুক্তি শুনে হেসে উড়িয়ে দেয়। কিচ্ছু ভেবোনা মা। এতে ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই।

ইলার সেবা ও যত্নে কয়েকদিনেব মধ্যেই মনীশ অনেকটা সুস্থ হয়ে ওঠে। সুস্থ হওয়ার পরও ইলার সেবা-যত্ন পাবার লোভটা সে কাটিয়ে উঠতে পারে না। মাথায় নামারকম দুষ্টু বুদ্ধি মাঝে মাঝে উঁকিঝুঁকি মারে। ইলাকে ঘরে ঢুকতে দেখলেই সে ঘুমেব ভান করে চোখ বুজে থাকে। কপালে হাত দিলেই সে দুষ্টুমি কবে তার হাতটা চেপে ধরে।

আঃ কী ঠাণ্ডা। বেশ লাগে, ছাড়তে ইচ্ছে করে না।

ইলা মনীশের দিকে শাসনের দৃষ্টিতে তাকায়। তার মনে হয় ইলার চাহনিটা যেন সান দেওয়া ইস্পাতের মত তীক্ষ্ণ। সঙ্গে সঙ্গে সে তার হাতটা সরিয়ে নেয়। তারপর চাদর দিয়ে আপাদমস্তক ঢেকে পড়ে থাকে। তার ছেলেমানুষী দেখে ইলা না হেসে থাকতে পারে না।

এ ক'দিনে অজ্ঞাতসারে মনীশ ইলার মনের খানিকটা অংশ দখল করে নিয়েছে। এর মূলে তার শিশুসুলভ স্বভাব ও আচরণ।

অসুখের সময় ইলা লক্ষ্য করেছে, জ্বরের ঘোরে মনীশ তাকে অনেক সময় জড়িয়ে ধরেছে। সে ডাক্তার রোগীর বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন রকমের আচরণের কথা সে জানে। এসব ক্ষেত্রে সামাজিক বাধা-নিষেধ সঙ্কোচ বা নীতির দোহাই দিয়ে সরে থাকা চলে না। বরঞ্চ রোগীকে আপন করে নিয়ে তার মেজাজ মর্জি মত চ'লে তাকে আরোগ্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়।

মনীশ কিন্তু নিজে জানে না, সে জ্বরের ঘোরে কখন কি রকম ব্যবহার করেছে। সে শুধু জানে ইলা তার জন্যে অনেক কষ্ট স্বীকার করেছে, যত্নআত্তি কবেছে। তাই সে মাঝে মাঝে বলে, আপনার ঋণ শোধ করা আমার সাধ্যাতীত।

ইলা হেসে উত্তর দেয়, কেন আপনিও তো মার অসুখের সময় যথেষ্ট সেবা যত্ন করেছেন।

তাই শোধ দিলেন বুঝি ?

যা' মনে করেন।

নির্লিপ্তভাবে জবাব দেয় ইলা।

মনীশের কানে উত্তরটা কেমন যেন লাগে।

সে স্থির করে, আর নয় দু-একদিনের মধ্যেই হোটেলে চলে যাবে। কিন্তু মনটা যেন তার সরতে চায় না। মৃণ্ময়ীর স্নেহ ও ইলার যত্নের লোভ সে কাটিয়ে উঠতে পারে না। কেমন একটা মমতা যেন তাকে ঘিরে ধরে।

মনীশের জন্যে মৃণ্ময়ীর উদ্বেগের সীমা নেই। তার মত লোক হোটেলে, বোর্ডিং-এ কি করে থাকবে তা' তিনি ভাবতে পারেন না। কিন্তু মানুষ হিসাবে তার তুলনা হয় না। তাই তিনি এক এক সময় ভাবেন, ইলার বিয়েটা মনীশের সঙ্গে দিলে কেমন হয়।

তিনি একদিন সরাসরি তার ইচ্ছেটা ইলার কাছে ব্যক্ত করেন।

ইলা হেসে উড়িয়ে দেয়।

মৃণ্ময়ী ভৎর্সনার সুরে বলেন, সব সময় ছেলেমানুষী করিসনে মা। যতই লেখাপড়া শেখোনা কেন, মেয়েদের একটা সহায় ও সম্বল দরকার। আমি চোখ বুজলে কে তোকে আগলাবে? দেখাশোনা করবে।

ইলা আবার হেসে ভেঙ্গে পড়ে।

আজকাল মেয়েরা আগের মত অসহায় নেই। সাবলম্বী হব বলেই তো ডাক্তারী লাইন বেছে নিয়েছি।

এসব তোর অভিমানের কথা।

অভিমানের কথা নয় মা, সত্যি বলছি, আমি সংসারী হব না।

এরকম কথা তো এর আগে কখনও শুনিনি। সলিলের কাছ থেকে আঘাত খেয়ে তুই এসব কথা বলছিস। সে ছাড়া কি আর ভাল ছেলে নেই?

এমনি সময় মনীশ মৃণ্ময়ীর ঘরের দিকে আসছিল। হঠাৎ মা ও মেয়ের কথাবার্তার টুকরোগুলো তার কানে যেতেই সে দেয়ালের আড়ালে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে।

মৃণ্ময়ী খোলাখুলিভাবে বললেন, আমার ইচ্ছে, মনীশের সঙ্গেই দি। তোর সম্মতি পেলে আমি যতীশকে, সুনন্দাকে লিখব। আমি জানি, এ প্রস্তাবে তারা খুসীই হবে। এবং মনীশও আপত্তি করবে না।

কি করে জানলে যে মনীশবাবু আপত্তি করবে না?

আমি মুখ দেখলেই বুঝতে পারি। তা' ছাড়া ছেলে হিসাবে তার তুলনা হয় না।

নিজের প্রশংসা নিজের কানে শুনতে যদিও মনীশের ভালো লাগে তবও সে সঙ্কোচ বোধ করে। তাই সে নিঃশব্দে ফিরে আসে

নিজের ঘরে। অলস চিন্তায় সে মনটাকে ডুবিয়ে রাখে। ইলাকে নিয়ে ছোট্ট একটা সংসার গড়ে তোলার স্বপ্ন, তার হাতের যত্ন ও স্পর্শ তাকে, লোভাতুর করে তোলে। সে মনে মনে তাকে একান্ত নিজস্ব ও নিবিড় করে পেতে চায়। মৃণ্ময়ীর মনে যখন প্রস্তাবটা এসেছে তখন সেটা ইলার কথার মারপ্যাঁচে একেবারে তলিয়ে যাবে না। তা'ছাড়া সে পাল্টা প্রশ্নটাও ইলার শুনেছে, 'কি করে জানলে মনীশবাবু আপত্তি করবে না?' একটা শিহরণ খেলে যায় মনীশের মনে ও দেহে। ইলার যে বিশেষ আপত্তি নেই এই প্রস্তাবে, তার প্রশ্নেই সেটা বোঝা যায়। তবে কি সে তাকে ভালবেসেছে? অসম্ভব নয়! প্রথমে সে নারী, তারপর সে ডাক্তার! ডাক্তারী বিদ্যার চাপে নারীর সব সাধ আকাঙ্ক্ষা তলিয়ে যেতে পারে না। কিছুতেই না।

ইলা শেষ পর্যন্ত মাকে তার সঠিক মতটা জানায় না। তবুও মৃণ্ময়ী মনে করেন, ইলার বিশেষ আপত্তি নেই।

মার সঙ্গে কথা শেষ করে এসে ইলা পায়চারী করে বারান্দায়।

ঘরের জানালার ফাঁক দিয়ে মনীশ দেখে ইলার সুন্দর সৌম্য চেহারাটা। অন্যদিনের মত সে এগিয়ে গিয়ে আজ আর কথা বলে না। সঙ্কোচ বোধ করে।

খানিকক্ষণ পায়চারী করে ইলা মনীশের ঘরের কাছে এসে জিজ্ঞেস করে, এখন কেমন বোধ করছেন?

বেশ ভাল। আমায় এখন ছুটি দিন হোটেলে চলে যাই।

ছুটি দেওয়ার মালিক মা।

মনীশের মনে পড়ে মা ও মেয়ের খানিক পূর্বের কথাবার্তা। সে ইলার কথাটা ইঙ্গিতপূর্ণ বলে ধরে নেয়।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসে। ইলা ঘরের বিদ্যুৎ বাতিটার সুইচ টিপে দেয়। আলোয় ঝলমল করে ওঠে ঘরটা।

মনীশের কল্পনা পীড়িত চেহারাটা যেন ধরা পড়ে যায় ইলার চোখে। ইলার চিন্তাক্লিষ্ট চেহারাটাও গোপন থাকে না মনীশের কাছে।

ইলা মনীশের মুখোমুখী বসে। সে বলে, শুনেছি এক জায়গায় কিছুদিন থাকলে লোকের মায়া পড়ে যায়। আপনাকে দেখলে কিন্তু বোঝা যায় না। যেই নির্বিকার সেই নির্বিকার। আমার কিন্তু আপনাদের দার্জিলি-এর বাড়ীটা ছেড়ে আসতে কষ্ট হচ্ছিল।

কি করে জানলেন, আমি নির্বিকার।

আকাশের অবস্থা দেখে।

আকাশ কিন্তু অনেক সময় বর্ণচোবা হয়। রঙ দেখে ঠিক বোঝা যায় না।

মনীশের দুর্বলতার লক্ষণ যেন প্রকট হয়ে ওঠে।

আপনারও দেখছি আর দশজনের মত বোধশক্তি আছে?

আচ্ছা, আপনি আমাকে কি ভাবেন বলুন তো?

একটা শিক্ষা ও সংস্কারের পুঁটুলি বিশেষ। বুনো রামনাথের কার্বন কপি। বলেই ইলা হেসে ফেলে।

আমি সত্যিই জানিনে কোত্থেকে রাজ্যের জড়তা এসে আমার মধ্যে বাসা বেঁধেছে। আমি যতই জড়তা কাটিয়ে উঠতে চাই ততই যেন আমাকে অক্টোপাসের মত জড়িয়ে ধরে।

আমার মনে হয় আপনাদের মত উচ্চ শিক্ষিত বিবেকপূর্ণ মানুষরা যদি মন ও দেহের জড়তা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সমাজের উন্নতির কাজে লাগে তা'হলে আমাদের সমাজের দুর্দশা অনেকটা ঘুচে যাবে।

আগ্রহের সঙ্গে মনীশ বলে, আপনি আমাকে কি ভাবে সমাজের কাজে লাগাতে চান বলুন?

আমার কথা আপনি শুনতে যাবেন কোন দুঃখে।

দুঃখে নয়, আনন্দে।

হঠাৎ ইলার হাতখানা চেপে ধরে মনীশ আবার বলে ওঠে, বিশ্বাস করুন আপনার সাহচর্যে আমি যে কোন ব্রত গ্রহণ করতে পারি।

ইলা আস্তে আস্তে হাতখানা সরিয়ে নেয়।

মনীশ আবেগে ভেঙে পড়ে।

আমি, আমি আপনাকে ভালবাসি।

সশব্দে হেসে ওঠে ইলা।

মন্তব্য করে, জগতে কিছুই অসম্ভব নয় দেখছি। বলেই ইলা উঠে চলে যায় নিজের ঘরে।

মনীশের পিঠে যেন চাবুকের ঘা পড়ে। বেত্রাহতের মত সে আঘাতটা সমস্ত শক্তি দিয়ে হজম করতে চেষ্টা করে।

ইলার মানস চক্ষের সম্মুখে ভেসে ওঠে একটা অতীতের ছবি। ময়না পাড়ায় কোন এক দুর্বল মুহূর্তে সলিল তার দুর্বলতার চরম পরিচয় দিয়েছিল। মনীশও আজ প্রমাণ করে দিল যে মানুষের সহজ নিরভিমান মনের অন্তঃস্থলে আর একটা সুপ্ত মানুষ বাস করে। সুযোগ পেলে সেই সুপ্ত মানুষটা হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করে। এর জন্যে ইলা নিজেকেই মনে মনে ধিক্কার দেয়। তার সহজ মেলা-মেশার প্রশ্রয়ে মনীশ বেপরোয়া হয়ে উঠেছে।

মনীশ তার ঘরে ফিরে আসে। সাময়িক নির্বুদ্ধিতা ও অসংযমের জন্য নিজেকে ধিক্কার দেয়। তাব যখনই মনে হয় সে চূড়ান্ত স্বার্থপরতার পরিচয় দিয়ে ফেলেছে তখনই তার অন্তরাত্মা তারই বিরুদ্ধে উগ্র হয়ে ওঠে। ইলার আন্তরিক সেবাযত্নের বিনিময়ে সে চরম আঘাত দিয়েছে। সে এক একবার ভাবে ইলার কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইবে, কিন্তু তা' সে পারে না। হাত-পা যেন তার অসাড় হয়ে আসে। অনেক ভেবেচিন্তে সে স্থির করে আজ রাত্রেই চলে যাবে সে এই বাড়ী ছেড়ে।

বিছানা পত্র গুছিয়ে নেয় সে। ঝিকে ডেকে বলে দেয়, সে

রাত্রিতে খাবে না ঠাকুরকে যেন বলে দেওয়া হয়।

ঝির মুখে খবরটা শুনে মৃণ্ময়ী ছুটে আসেন।

হঠাৎ বলা নেই কওয়া কওয়া নেই চলে যাচ্ছ যে ?

আজই তো যাওয়ার কথা ছিল।

মৃণ্ময়ী ভুল বোঝেন, মনীশ নিশ্চয়ই তার মতলবটা বুঝতে পেরে সরে পড়ছে। ছিঃ ছিঃ, কি লজ্জার কথা। এতদিন থাকতে দিয়ে স্নেহ করে তার বিনিময়ে স্বার্থের খাতিরে তাকে আটকে রাখতে চেয়েছেন। তাই সে চলে যেতে চাইছে।

চাকরের মাথায় বেডিং ও হাতে সুটকেশটা তুলে দিয়ে মনীশ ইলার ঘরের দিকে এগিয়ে যায়। ঘরের দরজা খোলাই ছিল। কোনরকম ভূমিকা না করেই সে বলে, আমি হোটেলে যাচ্ছি, যদি কোনদিন প্রয়োজন হয় তা'হলে স্মরণ করবেন। ছেলেমানুষীর জন্য আশা করি ক্ষমা করবেন। নমস্কার।

এ রকম নাটকীয় পরিস্থিতির জন্য ইলা তৈরী ছিল না। সে হ্যাঁ-না কিছুই বলে না।

ইলা ভাবে, বিচিত্র পুরুষের স্বভাব। নিজে অন্যায় করে অপরের প্রতি অভিমান প্রকাশ করতে এতটুকু দ্বিধা বোধ করে না।

কয়েকদিন পর ইলা মৃণ্ময়ীকে বলে, আমি চাকরী নিয়ে বাইরে যাচ্ছি, কাকদ্বীপে, ফ্রী কোয়াটার, তবে মাইনে অতি সামান্য।

মৃণ্ময়ী লক্ষ্য করেন ইলার এই সংবাদ দেওয়ার মধ্যে কোন উৎসাহ উদ্দীপনা নেই। কলের মত সে যেন বলে যায়।

বাইরে গিয়ে কাজ কি মা, এখানে কোন হাসপাতালে অথবা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে ডাক্তার হিসেবে থাকলেই তো হয়।

কাজ পাওয়া অতটা সোজা নয় মা। কি বছর বহু ডাক্তার

তৈরী হচ্ছে, কিন্তু সেই অনুপাতে চাকরি খালি হচ্ছে না। তা'ছাড়া তুমি জান, আমি ডাঃ পালকে কথা দিয়েছিলাম তাঁর প্রতিষ্ঠানে যোগদান করব, দুঃস্থদের সেবা করব।

এই বাড়ী, জিনিষপত্র এগুলি কি হবে?

যেমন আছে তেমনি থাকবে। দরওয়ান, মালী, ওরা থাকবে।

ইলা কয়েক মুহূর্ত কি ভেবে নিয়ে বলে, আমি ফি সপ্তাহে একবার আসব।

হঠাৎ মৃণ্ময়ীর অভিমানটা ঠেলে ওঠে।

আমার জন্যে তোকে ভাবতে হবে না। আমার আর ক'দিন?

তাঁর গলার স্বর ভারী হয়ে ওঠে। ইলা মার কাছে সরে আসে।

তুমি যদি এত ভেঙে পড় তা'হলে আমার যাওয়া হয় না মা। অথচ আমি কথা দিয়েছি, এগ্রিমেণ্ট সই করেছি।

শেষে স্থির হয়, মৃণ্ময়ী বাড়ীতেই থাকবেন। ইলা নির্দিষ্ট দিনে রওনা হয় কাকদ্বীপের উদ্দেশ্যে।

সলিল এখন দু-বেলা তার চেম্বারে বসে। পসারও কিছুকিছু হচ্ছে। কয়েক ঘণ্টার জন্যে তাকে কলেজেও বেরুতে হয়। সামান্য ভাতা সে পায় সেখান থেকে। নানারকমের রোগী দেখে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। যতই দিন যায় তার অবসরের মাত্রা ধীরে ধীরে কমে আসে। বাড়ীতেও বেশীক্ষণ থাকার সময় হয় না। রোগীর বাড়ী থেকে যখন তখন ডাক আসে। কৈলির নিঃসঙ্গতা বেড়ে যায়।

কৈলির সিঁড়ি ভাঙা ডাক্তারের নিষেধ। কাজেই সে খোলা বারান্দায় পাইচারী করে। মাঝে মাঝে লেকের দিকে তাকায়। তার মনে হয় লেকের ধারে খোলা জায়গায় একবার যেতে পারলে

ক্লান্তিটা বোধ হয় দূর হত। ঘর বন্দী থেকে বাধা-নিষেধের গণ্ডীর মধ্যে সে হাঁপিয়ে ওঠে। অনাগত শিশুর কচি মুখখানি ভেবে সে তার নিজের দেহের ও মনের কষ্টকে গ্রাহ্য করে না।

পাইচারী করতে করতে ক্লান্ত হয়ে সে বসে পড়ে রেলিঙের ধার ঘেঁষে বড় রাস্তার দিকে মুখ করে। নানারকম নারী-পুরুষ ফুটপাথ ধরে চলে। সময়টা তার এইভাবে কাটে।

দিনকয়েক পরে সলিল কৈলিকে নার্সিং হোমে দিয়ে আসে।

অসুস্থ বনবিহারী ক্ষীণকণ্ঠে সলিলকে অনুরোধ জানায়, খোকা হবার সংবাদটা আমাকে দিয়ো ছোটবাবু। আমি এ শুভ সংবাদটা শুনে মরতে চাই।

সলিল সন্ত্বনা দেয়, তুমি শীগগীর সেরে উঠবে।

বনবিহারী তার মিথ্যা সান্ত্বনা বাক্য শুনে হাসবাব চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। সন্ধ্যার দিকে আবার তার অসুখটা বেড়ে যায়।

দরোয়ানের ঘরের পাশের ছাপরাটায় সে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকে। প্রয়োজন মত ঝি-চাকরকে ডাকে। কেউ সাড়া দেয়, কেউ দেয় না। কৈলি চলে গেছে নার্সিং হোমে। বনবিহারীর মনটা কৈলিকে দেখবার জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকে।

সলিলকে এদিকে যেতে দেখলে সে কখনও কখনও জিজ্ঞেস করে, আমার মা কেমন আছে ছোটবাবু ?

ভাল আছে বিহারীদা।

সংক্ষিপ্ত জবাবটুকু দিয়ে বেরিয়ে যায় সলিল।

বনবিহারী বোঝে তার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে এ সংসার থেকে। সে আর বোঝা হয়ে থাকতে চয়ে না।

পূর্ণিমার দিন তার বেশ বাড়াবাড়ি হয়। খবর পেয়ে সলিল ছুটে আসে। ডাঃ রায় নীচে আসতে পারেন না বটে তবে ঘন ঘন খোঁজ নেন। সলিলকে নির্দেশ দেন, বড় ডাক্তার ডাকতে।

ডাঃ পাকড়াশী আসেন। পরীক্ষা করেন, যথারীতি ওষুধ দেন, কিন্তু ভরসা দেন না। বনবিহারীর অবস্থা ক্রমশঃ খারাপের দিকে যেতে থাকে। যখন তখন সে ভুল বকে। ভুল বকার বেশীর ভাগই বেশীর ভাগই তিরস্কার, ভদ্র সমাজকে গালাগাল। তাদের অমানুষিকতা, হৃদয়হীনতার নিন্দা, আর কৈলিকে সান্ত্বনা দেওয়া।

সলিল নার্সিং হোমে পৌঁছে দেখে কৈলিকে লেবার রুমে নিয়ে গিয়েছে। একটি নবজাত শিশুর চীৎকার তার কানে আসে।

খানিকক্ষণ পর নার্স এসে খবর দেয়, দিব্যি খোকা হয়েছে। সলিলের মনের মধ্যে হঠাৎ কি রকম একটা অনুভূতি খেলে যায়। হঠাৎ তার মনে পড়ে, বনবিহারীর অনুরোধটা। আসবার আগে সে তার যা' অবস্থা দেখে এসেছে তাতে বিশেষ ভরসা হয় না। সে হয়ত শুভ সংবাদের আশায় এখনও যমের সঙ্গে যুঝে চলেছে।

ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করেই সলিল নার্সিং হোম থেকে বেরিয়ে আসে। একটা ট্যাক্সি ডেকে সে উঠে পড়ে। বখশিসের লোভ দেখিয়ে জোরে ছোটাতে বলে গাড়ীটাকে। বাড়ীতে পৌঁছে সে দেখে বনবিহারীর ঘরের কাছে ভীড় জমে গিয়েছে। ডাঃ রায়ও রয়েছেন। কাজেই বিষয়ের গুরুত্ব বুঝতে তার দেরী হয় না। সে ছুটে আসে বনবিহারীর ঘরের কাছে। কিন্তু শুভ সংবাদটা দেওয়ার আগেই তার কানে আসে অশুভ সংবাদটা, বনবিহারী নেই।

দিন সাতেক পর কৈলি বাড়ী ফেরে। বাড়ীর থমথমে ভাবটা সে লক্ষ্য করে। প্রশ্ন করে, বিহারীদা কেমন আছে?

সলিলের চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে।

প্রকাশ্যে বলে, সে নেই।

কেলির মাথাটা ঘুরে যায়। সে আর দাঁড়াতে পারে না। সলিল তাকে ধরে এনে বিছানায় শুইয়ে দেয়।

ডাঃ রায়ের নির্দেশে শিশুর জন্যে নার্স ও ধাই রাখা হয়েছে। একটা আলাদা ঘরে শিশুর উপযোগী সুদৃশ্য খাটের মধ্যে শিশু থাকে। আর কৈলি পড়ে থাকে অদূরে একটা খাটে। সে মাঝে মাঝে শিশুমুখ দেখার জন্যে উঠে বসে। নার্স তাকে বারণ করে। মাঝে মাঝে ঠাট্টাও করে, এক মিনিট না দেখে থাকতে পারেন না! দুদিন বাদেই আপনার ছেলে আপনার কোলে পাবেন। শরীরটা ঠিক হোক আগে।

কৈ আমি তো তেমন অসুস্থ বোধ করছিনে।

সন্তানের স্নেহ বশতঃ অসুস্থতা গ্রাহ্য করছেন না। আসলে আপনি খুবই দুর্বল, এখনও অসুস্থ।

হয়ত নার্সের কথাই ঠিক হবে। তাই কৈলি আর তর্ক করে না।

নাতির আগমনে ডাঃ রায় মনে মনে খুসী হলেও নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না। তার কেবলই আশঙ্কা হয়, সাঁওতালী মেয়ের গর্ভের সন্তান কি রায় পরিবারের উপযোগী হবে! শিক্ষা, কৃষ্টি ও আভিজাত্য সর্ববিষয়ে এ পরিবারের মান রক্ষা করতে পারবে কি? অনেক ভেবে চিন্তে তিনি সলিলকে নির্দেশ দেন, শিশুকে ইউরোপীয় কায়দায় মানুষ করতে হবে, গভর্নেস, নার্স ও আয়া রেখে। তার যত্ন ও শিক্ষার যেন কোন ত্রুটি না হয়।

কৈলি এখন উঠে দাঁড়ায়। একটু একটু পাইচারী করে। মাঝে

মাঝে নার্স খোকাকে তার কোলে দেয়। আবার কারো পায়ের শব্দ পেলেই তক্ষুনি কেড়ে নেয়।

কৈলি বিরক্ত হয়ে বলে, আমার ছেলে আমার কোলে থাকবে তাতে অমন করো কেন ?

নার্স মিথ্যা অজুহাত দেখায়, আপনি যখন-তখন শূন্যে তুলে নাচান, তাতে আমার ভয় হয়। কেউ দেখলে আমাকে বকবেন।

যুক্তিটা কৈলির মনঃপুত হয় না। সে ভৎর্সনার স্বরে নার্সকে বলে, তোমার অত মাথা ব্যথা কেন ? আমার ছেলেকে আমি যা খুসী করব।

নার্স মাঝে মাঝে ডাঃ রায়ের সঙ্গে দেখা করে বুদ্ধি পরামর্শ নেয়। ডাঃ রায় তাকে প্রায়ই ডাকেন।

কৈলিকে নার্স বোঝায়, ডাঃ রায় শিশুর যাতে ভাল হয়, যত্ন হয় সে সম্বন্ধে তিনি তাকে উপদেশ দেন।

কৈলি খুশী হয় শুনে। নাতির মুখ দেখে নিশ্চয়ই খুশী হয়েছেন তিনি। সলিলের পরিবর্তনটাও সে লক্ষ্য করে। মাঝে মাঝে শিশুর মুখের আদলের সঙ্গে স্বামীর মুখের আদলটা মিলিয়ে দেখতে তার ভাল লাগে। একই মুখের ছাঁচ। ছোট আর বড়, এই যা তফাৎ। আর একটা তফাৎ তার চোখে পড়ে। শিশু কালো আর তার বাবা ফর্‌সা ধবধবে।

বনবিহারীর মৃত্যুর পর থেকেই কৈলি বোঝে রায় পরিবারে তার দুঃখ কষ্ট বোঝবার আর কেউ নেই। তার পায়ের নীচ থেকে ধীরে ধীরে পৃথিবীটা যেন সরে যাচ্ছে।

কুণালকে সে পেয়েও পায় না। মা হয়েও মাতৃত্বের অধিকার সে পূর্ণ খাটাতে পারে না। অসংখ্য বাধা নিষেধের ডোরে সে

আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা। মাইনে-করা নার্স ও আয়ার যে অধিকার আছে সেটুকু থেকেও সে বঞ্চিত। যখন তখন খুসী মত সে কুণালকে কোলে নিতে পারে না। রুটিন মত চলতে হয় তাকে। ঘুমাবার সময়, স্নানের সময়, খাওয়ার সময়, নির্দিষ্ট। ঘড়ি ধরে নার্স ও আয়া তাকে স্নান ও পথ্যি দেয়। তার সব চেয়ে বড় দুঃখ সে তার স্তনের একফোঁটা দুধও সন্তানের মুখে দিতে পারে না। এক একবার তার ইচ্ছা হয়, চেঁচিয়ে প্রতিবাদ জানাতে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে।

নার্স তাকে বোঝায়, ডাঃ রায় চান, মাষ্টার কুণালকে ইউরোপীয় কায়দায় মানুষ করতে। এ পরিবারের সকলেই এভাবে মানুষ হয়েছে কিনা তাই।

কথাটা শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে কৈলি।

নার্স নিরুপায় হয়ে কাজের অজুহাতে সরে পড়ে।

এক নাগাড়ে অনেকক্ষণ একা একা বকে যায় কৈলি। অভিসম্পাত করে অভিজাত সম্প্রদায়ের ব্যবস্থাকে। তার মনটা ফিরে যেতে চায় সেই জংলী পরিবেশের মধ্যে, যেখানে সত্যিকারের মানুষের মন নিয়ে, দাবী নিয়ে, মানুষ বাস করে। যে সমাজ মা ও শিশুর অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধটাকে অস্বীকার করে না,—পূর্ণ মাতৃত্বের অধিকার দিতে শিক্ষার প্যাঁচ কষে না, বিজ্ঞানের দোহাই দেয় না।

সে মাঝে মাঝে ভাবে এ সম্বন্ধে একদিন চূড়ান্তভাবে মীমাংসা করবে স্বামীর সঙ্গে। সে জিজ্ঞেস করবে তার অপরাধটা কোথায়? কেন তাকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়।

কিন্তু সে সুযোগ পায় না। সলিল দিন-রাত রোগী নিয়ে ব্যস্ত থাকে। সকালে বেরিয়ে যায়, ফেরে সেই রাত্রে। দুপুরের খাওয়াটা অনেকদিন বাইরেই সেরে আসে। রাত্রিবেলা ক্লান্ত হয়ে ফেরে।

তা' ছাড়া নার্স ও আয়ার সুমুখে এ বিষয় নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি করে সে একটা বিশ্রী সীন করতে চায় না।

সলিল অবশ্যই তার শারীরিক কুশল সংবাদ জিজ্ঞেস করে। ওষুধ-পত্রের ত্রুটি রাখে না। ঝুড়ি ঝুড়ি ফলও আসে, মা ও সন্তানের জন্যে।

ওষুধ ও ফলের বহর সলিলের কর্তব্যবোধের পরিচয় দেয় বটে, কিন্তু কৈলির মন খোঁজে আন্তরিকতার স্পর্শ, যা সে পায় না। দেহকে পুষ্ট করে তোলার জন্য দুধও ফলের রস যেমন উপযোগী তেমনি মনকে পুষ্ট করে তোলার জন্যে মনের খোরাকের প্রয়োজন। একথা শুনেছে সে তার ডাক্তার স্বামীর কাছে। কার্যতঃ এই হাড় মাংসের দেহটাকে সতেজ করে তোলার নিষ্ফল চেষ্টা করছে তার স্বামী। হাসি পায় কৈলির।

শরীরের দুর্বলতা সেরে যেতেই কৈলি বিকেলের দিকে একাই লেকে বেড়াতে যায়। খানিকক্ষণ বেড়িয়ে ফিবে আসে সে। কোন কোন দিন আয়াও যায় তার সঙ্গে। কুণালকে পরাম্বুলেটারে শুইয়ে আয়া ঠেলে নিয়ে চলে। তাও নার্সের অনুমতি নিয়ে। কারণ নার্স আবহাওয়া বিচার করে, শিশুর শরীব পরীক্ষা করে, তবে আয়াকে অনুমতি দেয়। মুক্ত হাওয়ায়, মুক্ত পরিবেশে কৈলি কিছুক্ষণের জন্যে কুণালকে অনেকটা নিজস্বভাবে পায়। এতে সে অনেকটা তৃপ্তি বোধ করে।

অলক ক'দিন ধরে লক্ষ্য করে কৈলি বেড়াতে আসে। আয়া সঙ্গে সঙ্গে থাকে বলে সে তার কাছ ঘেঁষে না। সুযোগের অপেক্ষায় থাকে সে। আজ তাকে একা দেখে সে ঠিক করে ফেলে তার পরিকল্পিত বিষ-ভাণ্ডারটুকু আজ নিঃশেষ করে দেবে। কৈলির কানে

ঢেলে দেবে সবটুকু। সে দ্রুতপদে এগিয়ে যায় কৈলির দিকে। হাত জোড় করে নমস্কার জানায়।

চিনতে পারছেন ?

কৈলি ঘাড় নেড়ে জানায়, হ্যাঁ। প্রতিনমস্কার জানাতে ভুল করে না সে।

মনে পড়ে আমাদের সেদিনকার কথা ? সেই বাদাম আর কুলপি বরফ খাওয়ার দিনটা ?

অলক চলতে চলতে লক্ষ্য করে, কৈলির চেহারার পরিবর্তনটা। সেই সতেজ সহজ ভাবটা নেই, সেই কান্তি নেই। মুখের মধ্যে যেন একটা হতাশ ভাব ফুটে উঠেছে। সে আবার প্রশ্ন করে, আপনি কি অসুস্থ ?

কৈলি চুপ করে থাকে।

সুযোগ বুঝে অলক বলে, দেখুন তেল আর জলে মিশ খায় না। আমি আগেই জানতাম সলিলটা এমন একটা কাণ্ড করবে।

বিস্ময়ের দৃষ্টিতে কৈলি তাকায় অলকের দিকে। সে ভেবে পায় না সলিল এমন কি করেছে।

অলক একটু হেসে বিষয়টাকে পরিষ্কার করে বলার চেষ্টা করে। বিষটুকু সে ঢেলে দেয় কৈলির কানে।

সেদিন সলিল বলছিল সে একটা ভুল করেছে আপনাকে বিয়ে করে। যেখানে কৃষ্টি ও শিক্ষার মিল নেই, সে সমাজের মেয়েকে বিয়ে করা ঠিক হয়নি, তা' ছাড়া...

তা' ছাড়া কি ?

ইলার প্রীতি তার মোহটা এখনও কাটেনি। তার সঙ্গে সলিলের বিয়ে হবার কথা ঠিক ছিল এবং ডাঃ রায় প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন।

কৈলি ভাবে হয়ত এসব কথা হয়ে থাকবে, নইলে অলক

জানবে কোত্থেকে। বন্ধুর কাছে বন্ধুর দুঃখের কথা বলা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তাকে চিন্তান্বিত দেখে অলক মনে মনে খুসীই হয়। সে বোঝে তার ওষুধে কাজ করেছে।

শুনলাম, আপনাদের একটি ছেলে হয়েছে। খবরটা অবশ্য সুনিল যথাসময়ে দিয়েছিল। কিন্তু গিয়ে দেখে আসবার সুযোগ হয়নি। এজন্য আমি লজ্জিত।

প্রত্যেকটি কথাব পব অলক তাকায় কৈলির দিকে। তার মুখের পরিবর্তনটা সে একমনে লক্ষ্য করে। আব সুযোগ বুঝে বলে যায়।

ডাঃ রায় যেরকম আভিজাত্যের গর্বে গাবত, আমার মনে হয় না যে তিনি সহজে ..

হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে কৈলি। সে অলকের চোখের দিকে তাকিয়ে বলে, আশ্চর্য আপনাব শিক্ষা। অপরের পাবিবারিক ব্যাপারে আলোচনা কবতে সঙ্কোচ হয না ?

অলক হেসে বিষয়টা হাল্কা কবতে চেষ্টা কবে, বন্ধু আব বন্ধু-পত্নী কি পব ?

উত্তর না দিয়ে কৈলি ক্ষিপ্রপদে বওনা হয় বাড়ীর দিকে।

অলক একটা তৃপ্তির হাসি হাসে। সে জানে মুখে কৈলি যাই বলুক না কেন. বাড়ী গিয়ে সে আহত পক্ষীর মত ছটফট করবে এবং ছটফটানিতে এই জ্বালা শেষ হবে না।

অলক সত্যিই অবাক হয়ে যায়, কৈলিব কথাবার্তা শুনে। এ ক'দিনে সে কী চমৎকার কথাবার্তা ও আদব কাযদা শিখেছে। একটা অশিক্ষিত জংলী মেয়ের পক্ষে কী করে সম্ভব হল ?

কৈলি কোন রকমে তার ক্লান্ত দেহটাকে টেনে নিয়ে আসে

রায়ভিলায়। অতিকষ্টে সিঁড়ি ভেঙ্গে তেতলায় তার নিজের ঘরে আসে। তার মাথার ভিতরটা যেন উত্তপ্ত বয়লারের মত গরম হয়ে ওঠে। ঘরে এসেই সে দেহটাকে এলিয়ে দেয় খাটের উপর। অলকের কথাগুলি যেন তার মাথার মধ্যে কিলবিল করতে থাকে। থেকে থেকে তাকে উত্তেজিত করে তোলে। সে সবকয়টি কথা মিলিয়ে দেখে নিজের জীবনের সঙ্গে, সঙ্গতি খুঁজে পায় কিনা। এতটুকু অসঙ্গতি তার চোখে পড়ে না। সলিলের ইদানীং উদাসীন আচরণ, ডাঃ রায়ের উগ্র আভিজাত্যের গর্ব, কুণালের উপর তার মাতৃত্বের অধিকার, নার্স, আয়া, পর পর সব বিষয়গুলো সে মিলিয়ে দেখে অলকের ইঙ্গিতগুলোর সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। তা' ছাড়া সলিল যেসব কথা অলককে বলেছে তা' নিশ্চয়ই তার মনের কথা। ধীরে ধীরে স্বামীর প্রতি তার মনটা বিরূপ হয়ে ওঠে। ইলার প্রতি তার দুর্বলতার লক্ষণগুলোও সে মিলিয়ে দেখে। সেই ময়নাপাড়া থেকে আজ পর্যন্ত প্রত্যেকটি ছোট-খাট ঘটনা মনে করতে চেষ্টা করে সে। মাথার ভিতরটা যেন কেমন করে ওঠে। খাটের বাজু ধরে সে নিজেকে সামলে নেয়।

আয়া এসে কুণালকে কোলে নিয়ে বারান্দায় যায়। অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে কৈলি। তার দিকে কারো খেয়াল নেই। নার্স ও আয়া নিয়মমাফিক কাজ করে যায়। একবার ফিরেও তাকায় না তার দিকে। তারা খুসী রাখতে চেষ্টা করে মুনিবদের। রায়-পরিবারে যে কৈলির কোন সম্মান বা মর্যাদা নেই এটা যেন তাদেরও বুঝতে দেরী হয়না। তাই তারা গ্রাহ্য করে না তাকে। কৈলি মাঝে মাঝে হিসেব নিকেশ করে দেখে সে কি পেলো এই অভিজাত পরিবারে বউ হয়ে এসে। যোগ-বিয়োগ করে শূন্য দাঁড়ায়। তার চেয়ে ঢের ভাল ছিল সেই জঙ্গলে পড়ে থাকা। প্রায়ই সে মনে মনে দুটো সমাজের তুলনা করে, শিক্ষিত ভদ্র

সমাজের লোকেরা মারধোর করে না বটে, তবে তিলে তিলে মেরে ফেলতে জানে। ভদ্রতার ও শিক্ষার মুখোস পরে পরোক্ষভাবে চূড়ান্ত অপমান করতে, অবহেলা করতে, ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করতে তারা এতটুকু সঙ্কোচ বোধ করে না। তাদের মুখে মধু, বুকে বিষ।

কৈলি দেখেছে এই সভ্য সংসারে উপভোগ্য অনেক কিছুই আছে। বেশীর ভাগই কৃত্রিম আনন্দের উৎস। তাব মনের সরল ও সহজ ভাব যেন এই অকপট পবিবেশেব প্রভাবে শুকিয়ে যাচ্ছে দিনকে দিন।

এই পরিবারের মধ্যে তার একমাত্র আকর্ষণ কুণাল। কুণাল যদি না থাকত তাহলে সে অনায়াসে এ সংসার ছেড়ে আবার জঙ্গলে ফিরে যেতে পাবতো।

সে মনে মনে স্থিব কবে চূড়ান্তভাবে সলিলের সঙ্গে একটা মীমাংসা করে ফেলবে। তাব জীবনের বোঝা হয়ে সে আর থাকতে চায় না। যদি থাকতে হয় তবে সে সম্পূর্ণ দাবী খাটিয়েই থাকবে, নইলে নয়।

সে মনে প্রাণে চায় সলিল যেন সুখী হয়। কুণাল যেন কোন কষ্ট না পায়। নিজের জন্যে অন্য কারও জীবনের সুখ-শান্তি নষ্ট হোক, তা সে কখনও চায়নি, আজও না। আজ যখন সে বুঝতে পেরেছে তার প্রতি তার স্বামীর মোহ কেটে গেছে, অনর্থক তাকে সামাজিক নিয়মের দোহাই দিয়ে আটকে রেখে কষ্ট দিতে চায় না সে।

সলিলের ফিরতে দেরী হয়। অপেক্ষা করে কবে কৈলি ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। পরদিন আবার সরল শিশুব মত সব কথা ভুলে যায়। ভুলে যায় সলিলের সুন্দর মুখ দেখে, কুণালের হাসি দেখে। ভাগ্যিস সে একটা কাণ্ড করে বসেনি। মনে মনে ভগবানকে সে অসংখ্য ধন্যবাদ জানায়।

আজ ক'দিন ধরে কুণালের জ্বর। দিনকে দিন জ্বর বাড়তির দিকে চলেছে। কোলকাতার বড় বড় বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের ডাকা হয়েছে। নানারকম ওষুধ পড়েছে কিন্তু জ্বর সারছে না। জ্বর বাড়তির দিকে গেলেই তড়কা হয়। ভয়ে আতঙ্কে কৈলি শিউরে ওঠে, কী হবে? সে কুণালের কাছে যায়। কিন্তু যত্ন করার সুযোগটুকু পায় না। দুজন নার্স ও দুজন আয়া পালা করে ডিউটি দেয়। সে শুধু নীরবে ভগবানের নিকট পুত্রের আরোগ্য কামনা করে।

প্রায় মাসটাক ধরে জ্বরে ভুগে কুণাল যেন বিছানাব সঙ্গে মিশে গেছে। তার দিকে তাকালেই কৈলির চোখের পাতা জলে ভারী হয়ে আসে। তার বিশ্বাস, অতগুলো নার্স ও ডাক্তারের কবল থেকে সে যদি একবার কুণালকে কোলে টেনে নিয়ে তার নিজের স্তনের দুধ দিতে পারতো তাহলে ছেলে তার ভাল হয়ে যেতো, চাঙ্গা হয়ে উঠতো। কুণালের জ্বব একটু কমেব দিকে আসে বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ সারে না। বাড়ীর সকলেই যেন হাঁপিয়ে ওঠে।

ডাঃ রায় দুবেলা টেলিফোনে বিশেষজ্ঞদের নিকট নাতিব অবস্থা জানান ও চিকিৎসা সম্বন্ধে পরামর্শ করেন। সলিল নিজে কাজের ফাঁকে ফাঁকে ছুটে আসে কুণালকে দেখতে। ওষুধ-পত্র সময় মত পড়ছে কিনা তদারক করে।

কৈলি নিশ্চিত ধরে নেয়, এভাবে তার ছেলে ভাল হবে না। ময়নাপাড়ার সুখন মাঝির কাছ থেকে সে জেনে নিয়েছিল বিশেষ একটা পাতার নাম, তৈরী করার নিয়মটাও। তার মনে পড়ে এই পাতার রস খেয়েই সলিলের জ্বর সেরে যায়। সে বকশিশের লোভ দেখিয়ে বাড়ীর ঝিকে দিয়ে বাজার থেকে নির্দিষ্ট গাছের

পাতা আনায়। তাকে দিয়ে রসটা তৈরী করে নেয়। তারপর সুযোগ খোঁজে কুণালকে খাইয়ে দেওয়ার। সুযোগটা আসে ক্ষণিকের জন্যে।

নার্স বাথরুমে, আয়া বারান্দায়। এই সুযোগটা কৈলি অবহেলা করে না। সযত্নে রক্ষিত পাতার রসটুকু সে ঢেলে দেয় কুণালের মুখে। কুণাল চেঁচিয়ে কেঁদে ওঠে। দৌড়ে ছুটে আসে আয়া ও নার্স। তারা কৈলিকে ঝিনুক হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হতভম্ভ হয়ে যায়। নার্স লক্ষ্য করে দেখে কুণালের গালের কস বেয়ে পাতার সবুজ রস গড়িয়ে পড়ছে। সে উদ্বিগ্ন হয়ে কৈলিকে উদ্দেশ করে বলে, এ কী করেছেন, কী দিয়েছেন ?

টোটকা ওষুধ।

এতে শিশুর খারাপ হতে পারে জানেন ? ডাঃ রায় শুনলে আমাদের যা'তা' বলবেন।

কৈলি সরোষে তাকায় নার্সের দিকে।

তার রোষপূর্ণ দৃষ্টির দিকে নজর পড়তেই নার্স মাথা নীচু করে নেয়। একটা তোয়ালে দিয়ে আস্তে আস্তে রগড়ে কুণালের গালের কস বেয়ে পড়া পাতার রসটুকু সে তুলে ফেলার চেষ্টা করে।

হঠাৎ সলিল ঘরে ঢোকে। নার্সকে এমনভাবে তোয়ালে দিয়ে কুণালের মুখ ঘষতে দেখে প্রশ্ন করে সে।

ব্যাপার কী ?

তখনও পাতার রসের দাগ ইতস্ততঃ ছড়িয়ে রয়েছে। নার্স অসহায়ভাবে সলিলের দিকে তাকায় কিন্তু জবাব দেয় না।

কৈলি চলে যায় তার নিজের ঘরে।

কৈলি চলে যেতেই নার্স কম্পিত কণ্ঠে জানায় কৈলির টোটকা ওষুধ প্রয়োগের কথা।

সলিল রাগে ফেটে পড়ে। কুণালকে অনেকক্ষণ পরীক্ষা করে

তারপর ঝড়ের বেগে কৈলির ঘরের দিকে ছুটে যায় সে। কৈফিয়ৎ তলব করে, কেন তুমি ও সব আজে-বাজে জিনিষ দিতে গেলে? জানো, এতে ছেলের মন্দ ছাড়া ভাল হবে না।

কৈলি যুক্তি দেখায়, অতশত ডাক্তারি ওষুধ দিয়ে কিইবা ভালো হয়েছে। জ্বর তো এখনও সারে নি।

যা' জানো না তর্ক কোর না।

আমি যা জানি তাই করেছি। দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দেয় কৈলি।

সলিল আবার ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে কৈলির উত্তর শুনে।

আমাকে একবার জিজ্ঞেস করেছ?

তোমরা আমাকে একবার জানিয়েছ কি করছ না করছ। কেন ছেলের জ্বর সারছে না, কি চিকিৎসা হচ্ছে, কোন কিছু আমাকে বলেছ?

রাগে সলিল ফেটে পড়ে।

তুমি কি বুঝবে? মূর্খ জংলী কোথাকার?

আমি মা, মা হয়ে আমি সন্তানের কোন কিছুতেই থাকতে পাইনে। স্ত্রী হয়ে স্ত্রীর মর্যাদা পাইনে, বলতে বলতে কৈলি কেঁদে ভেঙ্গে পড়ে।

সলিল সরোষে কৈলিকে উদ্দেশ করে বলে, ভাগ্যিস তোমার হাতে কুণালকে ছেড়ে দিই নি। তা হলে এতদিনে তার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যেত না।

একটু জিরিয়ে নিয়ে কৈলি দৃঢ়কণ্ঠে বলে, তুমিই না একদিন বলেছিলে, এই লতা, পাতা এলোপ্যাথি ওষুধের আদি উৎস। তা' যদি হয়, তা'হলে আজ লতাপাতার রস কুণালকে দেওয়াতে আমার কী অপরাধ হয়েছে শুনি!

আহত সর্পিণীর মত কৈলি আবার গর্জে ওঠে, সন্তানের উপর মায়ের দাবী যারা উপেক্ষা করে তারা কোন মুখে শিক্ষিত বলে দাবী

করে। যে স্বামী স্ত্রীকে মর্যাদা দিতে কুণ্ঠা বোধ করে, কোন মুখে সে স্বামিত্ব ফলাতে আসে। এর চাইতে আমাদের অশিক্ষিত, বর্বর, জংলী সমাজ ঢের ভালো।

কথা কয়টা এক নিঃশ্বাসে সে বলে ফেলে।

সলিল সরোষে কৈলির দিকে তাকিয়ে রাগে ফুলতে থাকে।

তারপর কুণালের ঘরে গিয়ে নার্স ও আয়াকে উদ্দেশ করে চেঁচিয়ে বলে, এখন থেকে কুণালের মা যেন কুণালকে কোন কিছু খেতে না দেয় দেখবে। খোকার দায়িত্ব তোমাদের উপর সম্পূর্ণ রইল।

কথা কয়টি দু'ঘরের মধ্যবর্তী দরজার ফাঁক দিয়ে কৈলির কানে এসে স্পষ্ট লাগে। সে বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কাঁদে। তার মাথার ভিতরটা কেমন যেন করে ওঠে। এক একবার তার ইচ্ছা হয় ছুটে পালিয়ে যেতে এই শিক্ষিত অবাঞ্ছিত খোঁয়াড়টার বাইরে। চিড়িয়াখানার জানোয়ারের মত বন্দী হয়ে অসহ্য জীবন আর সে কাটাতে চায় না। কুণালের সুন্দর শিশুমুখ নীরবে যেন তার দিকে তাকায়। ডাকে, মা এস, এস। আমি তোমার কাছে যাব। কচি হাত দুটো যেন বাড়িয়ে দেয়। কৈলি দুঃখের মধ্যেও পর্দাটা সরিয়ে দিয়ে ছুটে আসে কুণালের খাটের কাছে। কুণাল তখন ঘুমুচ্ছে। কয়েক মুহূর্ত পুত্রকে ভাল করে দেখে নিয়ে সে ফিরে আসে নিজের ঘরে।

বিছানার উপর শুয়ে শুয়ে সে ভাবে অনেক কথা। অতীত দিনের কথা। ময়নাপাড়া থেকে আজ পর্যন্ত সব ঘটনা সে খতিয়ে দেখে। আজ সে রিক্ত, নিঃস্ব।

পরদিন কৈলি ডাঃ রায়ের ঘরের পাশের সিঁড়িটা দিয়ে নেমে

যাচ্ছিল। হঠাৎ একটা কথা তার কানে আসে। ডাঃ রায় সলিলকে উপদেশ দিচ্ছেন।

কুণালকে কোন একটা চিলড্রেন হোমে দিতে হবে। কৈলির কোলে তাকে কিছুতেই ছেড়ে দেওয়া চলে না। বিশেষ করে সেদিনকার ঘটনার পর থেকে। তা' ছাড়া জংলী মায়ের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এলেই জংলী প্রবৃত্তিগুলো হয়ত বিকাশ হতে পারে। সন্তানের উপর মায়ের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না।

সিঁড়ির কোণে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে কৈলি কান পেতে থাকে। সলিল তার পিতার কথার উত্তরে কি বলে স্পষ্ট শুনতে পায় না সে। তবে তার স্বামী যে দ্বিমত নয় এ কথা বুঝতে তার আর বাকি থাকে না।

তার মাথার ভিতরটা হঠাৎ গরম হয়ে ওঠে। সে যেন টাল সামলাতে পারে না। কোন রকমে অতি কষ্টে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে আসে সে। বড় রাস্তায় নেমে অনেকটা স্বস্তি বোধ করে। রায়ভিলার বিষাক্ত পরিবেশটা থেকে বেরিয়ে এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।

কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে সে স্থির করে, সে আর রায়ভিলায় ফিরবে না। তার মনটা চলে যায় দূরে বহু দূরে। যেখানে কোন সূক্ষ্ম চক্রান্ত নেই, ভদ্রতার মুখোস নেই সেই পরিচিত পরিবেশের মধ্যে। সে আজ আর লেকের দিকে না গিয়ে অন্য পথে পা বাড়ায়, অচেনা অজানার উদ্দেশ্যে।

ইলা এসে যোগ দেয় ডাঃ পালের হাসপাতালে, কাকদ্বীপে। নামে মাত্র হাসপাতাল। অতি সামান্য সরঞ্জাম নিয়ে আরম্ভ করা

হয়েছে। সরকার থেকে যৎসামান্য সাহায্য পাওয়া যায়। বেশীর ভাগ অর্থ যোগায় বে-সরকারী সাহায্য প্রতিষ্ঠানগুলো।

ইলাকে পেয়ে ডাঃ পাল খুব খুসী হন। বলেন, বেঁচে গেলাম মা। তোমাদের পথ চেয়ে বসে আছি। এর দায়িত্ব তোমায় দিয়ে এবার ছুটি নেব। শরীরটা ভেঙে পড়ছে। একটু বিশ্রামের প্রয়োজন।

ইলা উত্তরে বলে, বেশ তো।

রোগীদের অধিকাংশই বহির্বিভাগের। গরীব চাষী, জেলে ও মজুরের দল। ইনডোর রোগীর জন্যে একটা ঘরে চারটে বেড আছে মাত্র।

হাসপাতালের অদূরে একটা ছোট্ট কোয়ার্টার। দু'খানা ঘর, একটা রান্নাঘর, বাথরুম, পায়খানা। এই কোয়ার্টারেই ইলা থাকে। ডাঃ পাল থাকেন হাসপাতালের সংলগ্ন আপিস ঘরে। বলতে গেলে আপিস ঘর ও ইমারজেন্সি ওয়ার্ড একই।

কর্মচারীর মধ্যে দু'জন ডাক্তার, একজন কেরানী, দু'জন পিওন, নার্স ও একজন ধাই। ডাক্তার দু'জনের মধ্যে ডাঃ পালই সর্বেসর্বা বড় সাহেব ও সুপারিন্টেন্‌ডেন্ট। দ্বিতীয় ডাঃ বিজন মুখার্জী কিছুদিন হল চটকলের ডাক্তার হয়ে চলে গিয়েছেন। তিনি চলে যাওয়ার পর থেকে ডাঃ পাল বড্ড অসহায় বোধ করছিলেন। এমনি সময় ইলার চিঠি পেয়ে তিনি যেন হাতে স্বর্গ পান। তবে একজন পুরুষ ডাক্তার পেলেই ভাল হত। কে আসবে উপোস থেকে মড়া ঘাঁটতে এই নোনা জলের দেশে? ইলাও যে বেশীদিন এখানে থাকতে পারবে তা ডাঃ পাল মনে করেন না। খুবই অস্বাস্থ্যকর জায়গা।

ডাঃ পাল অসুস্থ থাকলে কম্পাউণ্ডার শিবনাথ ডাক্তারের কাজ চালিয়ে নিত। রোগীরা তাকে ছোট ডাক্তার বলে ডাকে। সে মহাখুসা। ইলা আসতেই সে বিরক্ত বোধ করে। কোত্থেকে একটা ছুঁড়ি এসে জুটেছে। তার উপর খবরদারী করবে? অসহ্য! কিন্তু উপায় নেই। অপ্রসন্ন মনে সে কাজ করে।

অল্প ক'দিনের মধ্যেই ইলা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সে পরীক্ষা করে দুঃস্থ মেয়েদের ব্যবস্থা, ও ওষুধ দেয়। মেয়ে ডাক্তার আসার খবরটা ছড়িয়ে পড়ে। দেখতে দেখতে আশে পাশের গাঁ থেকে রোগীরা দলে দলে আসে। ইলার কাজ দিনকে দিন বাড়তে থাকে। অধিকাংশ রোগী অনাহার-ক্লিষ্ট, শার্ণ, দুর্বল। কাজেই রোগের কবলে পড়তে তাদের বিলম্ব হয় না। পড়লে, সহজে উঠতে চায় না। জীবন্ত কঙ্কালগুলোর গায়ে মাংস সহজে লাগে না। কোন রকমে ওষুধ ও চিকিৎসায় দাঁড় করালে আবার ক'দিনের মধ্যেই বিছানায় পড়ে। কাজেই হাসপাতালের বেড খালি থাকে না। রোগীর অভাব হয় না।

ডাঃ পাল মাঝে মাঝে বলেন, ফিরে যাও মা, তোমার সহ্য হবে না এই অজ পাড়া-গাঁ।

উত্তরে হেসে বলে ইলা, বেশ আছি কাকাবাবু।

বিকেলের দিকটা ইলা বেড়াতে বেরোয়। তাকে দেখলেই ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ঘিরে ধরে। মেয়েরা বলে, ডাক্তার দিদির দয়ার শরীর।

কথাটা ভিত্তিহীন নয়। যে ক'টা টাকা হাসপাতাল থেকে মাইনে হিসেবে সে পায় তার বেশীর ভাগটাই সে এদের মধ্যে বিলিয়ে দেয় ওষুধ-পত্র কেনার জন্যে।

কয়েক সপ্তাহ ইলা কোলকাতায় যেতে পারে না। মাকে জানায়, ভীষণ কাজের চাপ, একটু হাল্কা হলেই যাবে সে। কোন চিন্তার কারণ নেই, ভাল আছে।

এদিকে রায়ভিলার ভিতটা ধীরে ধীরে ধ্বসে পড়ে। ডাঃ রায় শোকে দুঃখে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। একটার পর একটা আঘাত এসে তাঁকে ঘায়েল করে ফেলে। যে পারিবারিক ঐতিহ্যের গর্বে তিনি এতদিন মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিলেন, কৈলির অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে তা খর্ব হয়। যে বাড়ীর বউ নিরুদ্দেশ হয়, সে বাড়ীর আভিজাত্য সম্বন্ধে গর্ব করার আর কিছুই থাকে না। দেখতে দেখতে তাঁর শরীর ও মন দুই-ই ভেঙে পড়ে।

শুয়ে শুয়ে তিনি এই অভিশপ্ত অভিজাত পরিবারের ধ্বংসের কারণটা তলিয়ে দেখতে চেষ্টা করেন। কারণটা খুঁজে পেতে বেশী দেরী হয় না। এ তাঁরই আত্মাভিমান, আভিজাত্য ও গর্বের পরিণতি।

বন্ধু অমর মুখার্জী সেদিন ঠিকই বলেছিল। জংলী মেয়েটাকে ঘষে মেজে সমাজের উপযুক্ত করে নিয়ে বউ-এর মর্যাদা দিলে ভালই হত। অন্ততঃ এমনভাবে রায়পরিবারের মুখে চুন-কালি পড়ত না। নির্দোষ সরল মেয়েটা যা লাঞ্ছনা গঞ্জনা পেয়েছে তার প... পালিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। অনুশোচনায় তিনি ভেঙে পড়েন।

সলিলকে ডেকে নির্দেশ দেন, যত টাকা লাগে লাগুক, কৈলিকে ফিরিয়ে আনতে হবে। ঘরের লক্ষ্মীকে ঘরে ধরে রাখতে হবে।

তিনি মনে মনে স্থির করেন, কৈলি ফিরলে তার কাছে একবার ক্ষমা চেয়ে নেবেন, বলবেন, তোর বুড়ো ছেলেকে ক্ষমা কর মা।

পুলিশে খবর দিয়ে, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে পুরস্কারের লোভ দেখিয়েও কৈলির কোন খোঁজ পাওয়া গেল না।—শেষে সংবাদপত্র মারফত সলিল জানতে পারে ছোটনাগপুরে একটি বিবাহিত

স্ত্রীলোকের মৃতদেহ পাওয়া গেছে। তারিখ মিলিয়ে সে দেখে ঘটনার দিন দুই আগে কৈলি নিরুদ্দেশ হয়েছে। তাছাড়া পত্রিকায় মৃতের চেহারা ও পোষাকের যে বর্ণনা দিয়েছে তার সঙ্গে কৈলির চেহারা ও পোষাকের বেশ মিল আছে। সলিল বেরিয়ে পড়ে ছোটনাগপুরের উদ্দেশ্যে।

পুলিশ মৃতদেহটাকে সদরে নিয়ে আসে। কেউ সনাক্ত করতে আসেনি দেখে কর্তৃপক্ষ যথারীতি ফটো রেখে দেহটাকে মর্গের ডাক্তারের হাতে তুলে দেয়। কাজেই সলিল দেখে শুধু মৃতের বিকৃত দেহের ফটোগুলো, চেহারা ও পোষাকের বিবরণ ইত্যাদি। অনেকটা মিলে যায়। মুখের আদল, পোষাক ও ডাক্তারের অনুমিত বয়সটা পর্যন্ত।

সলিলের বুঝতে বাকী থাকে না যে কৈলি তার প্রাপ্য দাবী থেকে বঞ্চিত হয়ে এই চরম পন্থা বেছে নিয়েছে। সবলের প্রতি প্রতিশোধ নেওয়ার উপায় না থাকলে এমনি করেই দুর্বল প্রাতশোধ নেয় নিজের উপর।

শোকে ও অনুশোচনায় ভেঙে পড়ে সলিল। কৈলির সরল মুখখানা তার মনের পটে ভেসে ওঠে।

দিন দুই পরে সলিল কোলকাতায় ফিরে পিতাকে দুঃসংবাদটা দেয়।

কৈলির আত্মহত্যার সংবাদটা পেয়ে ডাঃ রায় মর্মাহত হন বটে কিন্তু আশ্চর্য হন না। এই আঘাত তিনি বেশীক্ষণ সহ্য করতে পারেন না। রক্তের চাপ দেখতে দেখতে অস্বাভাবিক বেড়ে যায়। তিনি চেঁচিয়ে ওঠেন, অসহ্য, অসহ্য যন্ত্রণা। তাঁর অস্থিরতা ক্রমেই বাড়তে থাকে। তিনি যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকেন।

সলিল ছুটে গিয়ে ডাঃ সোমকে নিয়ে আসে। কিন্তু তাঁর চিকিৎসা করার আর প্রয়োজন হয় না, কারণ তার আসার আগেই ডাঃ রায়ের শেষ নিঃশ্বাস বেরিয়ে যায়।

রায়ভিলার আভিজাত্যের গর্ব শেষ হয়ে যায় ডাঃ রায়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই। বাড়ীর ছন্নছাড়া চেহারাটা অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আত্মপ্রকাশ করে। সাংসারিক বিষয়ে অনভিজ্ঞ সলিল যেন দিশাহারা হয়ে পড়ে।

ভাগ্যিস কুণাল দার্জিলিং-এ চিলড্রেন হোম-এ আছে। নইলে অযত্নে অবহেলায় সে নিশ্চয়ই অসুস্থ হয়ে পড়ত।

মৃণ্ময়ী ইলার চিঠি পান। প্রত্যেক চিঠিতেই সে জানায় কাজের চাপ কমলেই আসবে। কোন চিন্তার কারণ নেই।

মনীশ এসে মাঝে মাঝে মৃণ্ময়ীর খোঁজ-খবর নেয়। সেদিন মৃণ্ময়ী আর মনীশ দোতলার খোলা বারান্দায় বসে কথাবার্তা বলছেন, এমনি সময় সলিলকে এদিকে আসতে দেখে মৃণ্ময়ী আশ্চর্য হয়ে যান। তার হাতে কুশাসন, গলায় কাছার সঙ্গে চাবি ঝুলানো, খালি গা, খালি পা, পরনে খাটো মোটা কোরা ধুতি।

তিনি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতেই সলিল বলে, আজ দিন আটেক হল বাবা স্বর্গে গেছেন।

কই আমরা তো তাঁর অসুখের বাড়াবাড়ির কোন খবর পাইনি।

হঠাৎ চলে গেলেন। ইদানীং তিনি খুবই ভেঙে পড়েছিলেন। মানসিক অশান্তিই এর মূল কারণ।

বলতে বলতে সলিল হস্তস্থিত কুশাসনটা মেঝের ওপর বিছিয়ে বসে পড়ে। তারপর সে তার দুর্ভাগ্যের কথা ধীরে ধীরে শেষ করে। শুধু কৈলির পালিয়ে যাওয়ার ও আত্মহত্যার কথা সে মনীশের সুমুখে ইচ্ছে করেই গোপন রাখে। জানায়, কৈলি মারা গেছে কোলকাতার বাইরে। মৃণ্ময়ী সব শুনে যেন হতবাক হয়ে যান। কী-বলে যে তিনি সান্ত্বনা দেবেন ভেবে পান না। চোখের কোণ দুটো তাঁর জলে ভরে ওঠে।

অনুযোগের স্বরে বলেন. তোমার অতবড় বিপদে আমাদের ওপর অভিমান করে চুপ করে থাকা ঠিক হয়নি বাবা।

সলিল কোন কৈফিয়ৎ খুঁজে পায় না। খানিকক্ষণ অপরাধীর মত মাথা নীচু করে থেকে সে বলে, মাসীমা, আসছে রোববারেই বাবার কাজের দিন। যাবেন কিন্তু, যা' করবার সব করে দেবেন। কি করতে হবে না হবে, আমি কিছুই জানিনে।

তারপর মনীশের দিকে তাকিয়ে বলে, মনীশবাবু আপনিও যাবেন কিন্তু।

মনীশ অবাক হয়ে যায়। কী করে এই অপরিচিত ভদ্রলোক তাকে চিনতে পারল। কে সে?

মৃণ্ময়ী পরিচয় করিয়ে দেন, ডাঃ সলিল রায়, ইলার বন্ধু। এর বাবার সঙ্গে ইলার বাবারও বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। সেই সূত্রে আমাদের দু' পরিবারের মধ্যে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মে।

মনীশ সলিলকে উদ্দেশ করে প্রশ্ন করে, আচ্ছা, আপনি আমাকে চিনলেন কী করে বলুন তো?

সলিলের হয়ে মৃণ্ময়ী উত্তর দেন, বোধ হয় ইলার মুখে তোমার কথা শুনেছে।

সলিল হেসে বলে, গুণী-মানী লোকের পরিচয়টা গোপন থাকে না।

সে তার হস্তস্থিত কাপড়ের ঝোলা থেকে একটা নেমন্তন্ন চিঠি

বার করে। মনীশের নামটা লিখে তার হাতে দিয়ে আবার অনুরোধ জানায়, যাবেন কিন্তু, আমার বিশেষ অনুরোধ।

আচ্ছা, চেষ্টা করবো'খন।

সলিলের চোখ খোঁজে ইলাকে। তাকে দেখতে না পেয়ে সে মনে করে ইলা হয়ত বাড়ীতে নেই। কয়েক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে সে মৃণ্ময়ীকে বলে, মাসীমা, ইলাকেও বলবেন যেতে।

ও, ভাল কথা, বলতে ভুলে গেছি। ইলা তো এখানে নেই। আজ প্রায় মাস দেড়েক হল সে কোলকাতার বাইরে গেছে কাজ নিয়ে, ডাঃ পালের হাসপাতালে। তবে আসছে শনিবার আসবার কথা, এলে সে নিশ্চয়ই যাবে।

সবাই গেলে খুব খুশী হব। বলেই সলিল ধীর পদে সিঁড়ি ভেঙে নেমে যায়।

সলিল বেরিয়ে যেতেই মনীশ মন্তব্য করে, বেশ চমৎকার লোক, দেখলে শ্রদ্ধা হয়।

হ্যাঁ বাবা।

একটা দুঃখের নিঃশ্বাস বেরিয়ে যায় মৃণ্ময়ীর মুখ থেকে। কোন রকমে চোখের জল সামলে নিয়ে তিনি বলেন, বড় দুর্ভাগা। পরিবারটা এ ক'দিনের মধ্যেই ভেঙে খান খান হয়ে 'ল।

সলিল পথ চলতে চলতে স্থির করে, নেমন্তন্ন পর্বটা যতটা সম্ভব আজই সেরে ফেলবে। বাড়ীর শেষ কাজ। সে বন্ধু-বান্ধবী আত্মীয় স্বজন কাউকে বাদ দেয় নি। গোলপার্কের কাছাকাছি আসতেই তার চোখে পড়ে অলকদের বাড়ীটা। কিন্তু বাড়ীতে সে অলককে পায় না। অগত্যা নেমন্তন্ন চিঠিটা তার বাবার হাতে দিয়ে বিশেষ অনুরোধ জানায়, সবাইকে নিয়ে অলক যেন নিশ্চয়ই যায়।

কাকদ্বীপ থেকে ইলা ছুটিতে আসে শনিবার বিকেলে। তাকে ক্লান্ত দেখে মৃণ্ময়ী রায়ভিলার দুঃসংবাদগুলো তখনকার মত ইচ্ছে করেই গোপন রাখেন।

ইলা মাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে হাসপাতাল ও পরিবেশের একটা সুন্দর বর্ণনা দেয়। বলে, আমার বেশ ভাল লাগে নিরীহ গ্রামের লোকগুলোকে। তাছাড়া ডাঃ পালকে তো চেনোই, তিনি আমাকে মেয়ের মত স্নেহ করেন। খুব ভাল আছি।

যতই সরস সুন্দর করে কাকদ্বীপের কথা বলুক না কেন ইলা, মৃণ্ময়ীর মনটা তার সব কথা বিশ্বাস করতে চায় না। কারণ, মায়ের চোখকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। তার ক্লিষ্ট চেহারাটা প্রমাণ করে দেয় সেখানকার পরিস্থিতিটা আদৌ ভাল নয়।

রাতটা মা মেয়ের গল্প করে মন্দ কাটে না।

পরদিন সকালে ইলার জলখাবার শেষ হলে, মৃণ্ময়ী জানান রায়-পরিবারের দুর্ভাগ্যের কথা।

ইলা শুনে হতভম্ব হয়ে যায়। সে বলে, মা, তুমি নিশ্চয়ই ভুল খবর পেয়েছো।

ভুল খবর নয় মা। সলিল নিজে এসে বলে গেছে সেদিন।

ইলার মাথার ভেতরটা কী রকম যেন করে ওঠে। অত বড় বিপদেও সলিল তাকে কোন খবর দেয়নি। অভিমানটা তার বড় হয়ে গেল। সে মার কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে স্বচ্ছন্দে লিখে জানাতে পারত, বনবিহারী, কৈলি ও কাকাবাবুর কথা।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সে মৃণ্ময়ীকে অনুযোগের স্বরে বলে, তুমি তো চিঠি লিখে আমাকে একটা খবর দিতে পারতে।

মৃণ্ময়ী ইচ্ছে করেই চুপ করে থাকেন।

ইলা ড্রেসিং রুমের দিকে ছুটে গিয়ে পরনের শাড়ী ব্লাউজ পাল্টে নেয়।

মৃণ্ময়ী প্রশ্ন করেন, কোথায় যাচ্ছিস ?

রায়ভিলায়।

আমিও যাবো।

বেশ তো চলো। সে চেঁচিয়ে দরোয়ানকে বলে ট্যাক্সি ডাকতে।

মৃণ্ময়ী তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নেন। তাঁর আশঙ্কা ইলা হয়ত বাড়াবাড়ি কিছু করে ফেলবে।

বাড়ী ফিরে অলক সলিলের নেমন্তন্ন চিঠি পেয়ে অবাক হয়ে যায়। সলিল যে তাকে বাড়ী বয়ে এসে তার পিতার মৃত্যু সংবাদ জানাবে এবং শ্রাদ্ধে নেমন্তন্ন করবে তা সে ভাবতে পারেনি। কারণ, সে জানে তার প্রতি সলিলের এতটুকু ভালবাসা বা বিশ্বাস নেই। তাই তার মহত্ব ও উদারতার কাছে সে মনে মনে নতি স্বীকার না করে থাকতে পারে না। সে স্থির করে নিশ্চয়ই এ নেমন্তন্ন রক্ষা করবে এবং আন্তরিকভাবে তাকে যথাসাধ্য সাহায্য করবে।

রায়ভিলায় এসে ইলা সলিলের চেহারার অদ্ভুত পরিবর্তন দেখে দুঃখে কাতর হয়ে পড়ে। কেমন আছ, প্রশ্নটা আর তার মুখ দিয়ে বেরোয় না।

মৃণ্ময়ী শ্রাদ্ধের আয়োজনের বন্দোবস্ত করে দেন।

সলিলকে একা পেয়ে অনুযোগের স্বরে ইলা প্রশ্ন করে, আমাকে একটা খবর দাওনি কেন ?

এ প্রশ্নের জবাব সলিল না দিয়ে নীরবে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।

ইলা আবার প্রশ্ন করে, কৈলির কি হয়েছিল ?

সলিল সংক্ষেপে বলে যায় কৈলির নিরুদ্দেশ হওয়া ও আত্ম-হত্যার কথা। অনুতপ্তের স্বরটা ফুটে ওঠে তার কণ্ঠে।

ইলার চোখের পাতা ভিজে ওঠে। সে বলে; ওঃ কী নিষ্ঠুর তুমি!

অস্বীকার করে না সলিল ইলার অভিযোগটা। সে মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করে তার গাফিলতি ও অবহেলার কথা।

ইলা ভেবেছিল খানিকটা কাজের সাহায্য সে করতে পারবে। কিন্তু সব শুনে তার হাত পা যেন অসাড় হয়ে আসে। সে একটা চেয়ারে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে আর ভাবে এ কী হল?

ডাঃ রায়ের সাজানো বাগান এমনিভাবে শুকিয়ে যাবে তা সে কল্পনাও করতে পারেনি। তার মনে পড়ে, তাকে তিনি একদিন অনুরোধ জানিয়েছিলেন, যদি দুর্দিন আসে মা, তবে সলিলকে সাহায্য করিস, নইলে সে ভেঙে পড়বে, সে বড় দুর্বল, অসহায়। অন্ততঃ বন্ধুত্বের খাতিরে।

সে মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়েছিল। কিন্তু এই যথার্থ দুর্দিনের সময় সে ভেবে পায় না কী ভাবে সে সলিলকে সাহায্য করবে!

অলক আসে তার বাড়ী থেকে বেশ খানিকক্ষণ আগেই। মনীশও এসে হাজির হয় সন্ধ্যার সময়।

কোন ভূমিকা না করেই অলক কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে কাজে লেগে যায়। মনীশও চুপ করে থাকে না। অতিথিদের সম্বর্ধনা করে, বসায়।

ইলা অলকের নতুন রূপটা দেখে অবাক হয়ে যায়। এ আর একটা ফন্দি নয়ত? কিন্তু সে কোন মন্তব্য করে না। তার সঙ্গে কথাও বলে না।

অলক কিন্তু এতটুকু বিশ্রাম নেয় না। পরিবেশনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব সে নিজের ঘাড়ে নেয় এবং সুষ্ঠু ভাবেই করে।

শ্রাদ্ধ কার্যাদি ও অতিথিদের খাওয়া-দাওয়া শেষ হতেই মনীশ অলক আর ইলা বসে। অদূরে দাঁড়িয়ে সলিল দেখাশোনা করে।

সলিল, মনীশ ও অলককে ধন্যবাদ জানায়। অলককে উদ্দেশ করে বলে, সত্যিই তোমার কাছ থেকে অতখানি আশা করিনি। তুমি যথেষ্ট করেছো।

উত্তরে অলক বলে, এটা আমার কর্তব্য।

সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করে, আচ্ছা মিসেস বনানীকে দেখছিনে তো? আর সে বুড়ো চাকরটাই বা কোথায়?

সজল চোক্ষে সলিল উত্তর দেয়,আজ ক'দিন হল দু'জনেই স্বর্গেগেছে।

অলক পাত থেকে হাতটা তুলে নেয়। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সে বলে, কী আশ্চর্য, আমি ভাবতেই পারিনি তোমার অত বড় বিপদ! কী অসুখ হয়েছিল বনানীর?

অসুখ কিছু নয়, সে বোধ হয় স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করেছে।

ইলা বলে, এখন ওসব কথা থাক।

উত্তরে অলক অনুতপ্ত কণ্ঠে বলে, না, না, থাকবে না। আমাকে শুনতে দাও, বলতে দাও।

হঠাৎ সে উঠে দাঁড়ায়। অনুশোচনায় ভেঙে পড়ে বলে, তার মৃত্যুর জন্যে আমিই দায়ী। একদিন লেকে আমি তাকে মিথ্যে বলেছিলাম যে সলিল তাকে পেযে সুখী নয় তেলে-জলে মেশে না। শুনে মনটা তার ভেঙে পড়েছিল। একটা ভয়ঙ্কর নৈরাশ্যের ছবি ফুটে উঠেছিল তার চেহারায়।

একটা ঢোঁক গিলে নিয়ে সে চেঁচিয়ে বলে, আমিই দায়ী তার মৃত্যুর জন্যে, সলিলের অশান্তির জন্যে। আমায় যা শাস্তি দিতে হয়, তোমরা দাও।

সলিল, ইলা আর মনীশ, অলকেব স্বীকারোক্তি শুনে হতভম্ব হয়ে যায়। একি সত্যি বলছে অলক, না এ আর এক প্রকার ছলনা মাত্র, নতুন অভিসন্ধি কে জানে!

সলিলের ইচ্ছে হয় চরম প্রতিশোধ নিতে অলকের উপর।

মুখের চেহারাটা তার কঠিন হয়ে ওঠে। কিন্তু কি একটু ভেবে নিয়ে সে চুপ করে থাকে। আজ তার পিতার শ্রাদ্ধের দিন, অলক নিমন্ত্রিত অতিথি। তা' ছাড়া অপরাধ সে মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছে।

ইলা অলকের দিকে তাকিয়ে গর্জে ওঠে শুধু তাই নয়, তুমি অনেকের জীবন নষ্ট করতে চেয়েছো।

অনেকের নয় তোমার এবং সলিলের।

কেন, কেন? আমরা কী অপরাধ করেছি বলতে পার? প্রশ্ন করে সলিল।

অপরাধ তোমাদের নয, আমারও নয়। আমাব ঈর্ষা, মজ্জাগত ঈর্ষা আমার ইন্ধন জুগিয়েছে। আমি অসহায়, হেল্পলেস। আমাকে ক্ষমা কর। প্রায়শ্চিত্ত করার সুযোগ দাও। বলেই সে ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

অলক বেরিয়ে যেতেই নির্বাক দৃষ্টিতে সলিল, ইলা আব মনীশ পরস্পরের দিকে তাকায়। খানিকক্ষণ পর মনীশ মন্তব্য করে, কী আশ্চর্য প্রকৃতির লোক। আমাকে সেদিন বাড়ী ধরে নিয়ে গেলেন, অনিমেষ সেন বলে, নিজেব পরিচয় দিলেন, ইলাদেবীদের সব কথা জেনে নিলেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। আবো বললেন, তিনি ইলা দেবীর মাসতুতো ভাই হন।

সলিলের মনে পড়ে সেদিন কী কৌশল কবে অলক, ইলা আর মনীশের গল্প করার দৃশ্যটা দেখিযেছে তাকে। কী ভয়ঙ্কব প্রতিশোধ পরায়ণ!

ইলা আব মনীশ উঠে দাঁড়াতেই সলিল অনুযোগের স্বরে বলে, তোমরা উঠে পড়লে যে।

ইলা উত্তর দেয়, আমাদের খাওয়া হয়ে গেছে অনেকক্ষণ।

মনীশ হাত মুখ ধুয়ে বিদায় নেয়। সে ইলাকে বলে, আমিই হোটেলে যাওয়ার পথে মাসীমাকে বাড়ী পৌঁছে দেব'খন।

ইলা বলে, বেশ তাই করুন। আমার ফিরতে একটু দেরী হবে।

কাজের বাড়ীর ঝঞ্ঝাট মিটে যেতেই ইলা সলিলকে বলে, এখন একটু বিশ্রাম কর। সারাদিন বড্ড ধকল গিয়েছে।

সলিল অদূরে রক্ষিত ইজি চেয়ারটার উপর বসে পড়ে। ইলাও বসে পড়ে কাছাকাছি আর একটা চেয়ারে।

সলিল প্রশ্ন করে, কবে ফিরে যাবে কাজে ?

দিন দুই পরে।

নিরাশ কণ্ঠে সলিল বলে, তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি রাখতে পেরেছো, কিন্তু আমি পারিনি। একদিন তুমি বলেছিলে, আমাকে ভুলের মাশুল দিতেই হবে। আমি তা দিয়েছি এবং পুরো মাত্রায়।

ইলা তাকে নিরস্ত করে, থাক ওসব বাজে কথা।

আমাকে বলতে দাও ইলা। আমি স্থির করেছি আমার দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবো। ডাঃ পালের কাছে যাবো। তুমি তো ওখানেই আছ, যদি পার ডাঃ পালের সঙ্গে কথাবার্তা বলে দেখ।

কুণাল ? প্রশ্ন করে ইলা।

কুণালের জন্যে ভাবনা নেই। সে থাকবে দার্জিলিং-এর হোমে। এখন যেখানে পড়াশোনা করছে।

না কুণাল যতদিন মানুষ না হয়, ততদিন তোমার অন্য কোন কাজে যাওয়া চলবে না। বিশেষ করে যেখানে অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা নেই। এখন তাকে মানুষ করাই তোমার প্রধান কাজ।

বিরক্ত হয়ে ওঠে সলিল। উপদেশ আর ভালো লাগে না ইলা আমাকে খুসীমত চলতে দাও।

এমনি সময় একটা জরুরী তার হাতে করে শিউচরণ দরোয়ান এসে হাজির হয়।

তারটা হাতে নিয়ে সলিল সই করে দেয়। খামটা খুলে

একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েই সলিল ইলার দিকে বাড়িয়ে দেয়।

ইলা এক নিঃশ্বাসে পড়ে, মাষ্টার কুণাল সিরিয়াসলি ইল, কাম সার্প।

সে সলিলকে বলে, এখন কি করবে ?

যা বলবে তাই। নৈরাশ্যে ভেঙে পড়ে সলিল।

ইলা টেবিলের উপর রক্ষিত টেলিফোনটা ডায়েল করতে গিয়ে থেমে যায়। মনে পড়ে, এখন বুকিং অফিস সব বন্ধ।

ইলা স্থির করে, পরদিন সকালে তারা রওনা হবে দার্জিলিং।

সলিল বলে, তোমার গিয়ে কাজ নেই। নিজেকে আমার বিপদের সঙ্গে জড়িয়ো না ইলা! তুমি তোমার কাজে গিয়ে যোগদান কর। তুমি না গেলে গরীব দুঃখী রোগীদের অসুবিধার অন্ত থাকবে না, প্লিজ গো।

আমাকে আমার কর্তব্য করতে দাও। বাধা দিও না।

তোমার কর্তব্য !

হ্যাঁ, আমার কর্তব্য, তোমাকে সাহায্য করা, রায়পরিবারকে বাঁচানো !

একি বলছো ইলা ?

ঠিকই বলছি সলিল।

সলিল মনের বল আবার ফিরে পায়। সে কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে তাকায় ইলার দিকে, প্রিয় বান্ধবীর দিকে।

পরদিন প্লেনে উঠে সলিল ইলাকে বলে, যদি একটা কিছু ঘটে যায় তবে আর ফিরবো না, ফিরতে পারবো না, কিছুতেই না।

ইলা ধিক্কার দেয়।

তুমি না পুরুষ! পুরুষের অত ভেঙে পড়া লজ্জার কথা। তারপর

কি একটু ভেবে নিয়ে বলে, প্রয়োজন হলে, ডাক্তার মত দিলে কুণালকে নিয়ে আসবো কোলকাতায়।

কে তার দেখাশোনা করবে ?

যে দায়িত্ব নিয়ে আসবে সেই।

সত্যি বলছো ইলা!

ইলা কখনও মিথ্যে বলে না, তা' তুমি ভাল করেই জান।

যথা সময়ে সলিল ইলাকে নিয়ে এসে পৌঁছে কুণালের চিল্‌ড্রেন্স হোমে।

সুপারিন্‌টেণ্ডেন্টের কাছে স্লিপ পাঠাতেই ফাদার ষ্টুয়ার্ট সহাস্যে বেরিয়ে আসেন। অভ্যর্থনা জানান। বলেন, আর ভয় নেই। মাষ্টার কুণালের ক্রাইসিস পার হয়ে গেছে। থ্যাঙ্ক গড। ব'লে সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে হাতের ইঙ্গিতে ক্রশ করেন এবং তিনি নিজেই নিয়ে আসেন ইলা ও সলিলকে ওয়ার্ডের দিকে। আসতে আসতে বলেন, এ যাত্রা মাষ্টার কুণাল বেঁচে গেল শুধু একজনের অক্লান্ত সেবা ও যত্নে। এমনটি আর দেখা যায় না। বিশেষ করে কোন আযাকে।

সলিল খুসী হয়ে বলে, আয়াকে মোটা বখশিস দোব'খন।

ফাদার সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে বলে ওঠেন, না, না, এ ভুল করবেন না। যারা এমনভাবে প্রাণ ঢেলে রোগীর সেবা-যত্ন করে, তারা বখশিসের আশায় করে না, করে প্রাণের মমতায়। কিছু দিতে গেলে সে অপমান বোধ করতে পারে।

সুদৃশ্য হাসপাতালটি ইঙ্গিতে দেখিয়ে ফাদার বলেন, আমাদের

স্কুলের নিজস্ব হাসপাতাল, কোন ত্রুটি নেই বন্দোবস্তের। তিনি গর্বের হাসি হাসেন।

ইলা ও সলিলকে নিয়ে তিনি দশ নম্বর কেবিনের দিকে এগিয়ে যান। তাদেব একটু বাইরে অপেক্ষা করতে বলে তিনি ভেতরে যান। ফিরে এসে বলেন, আপনারা আস্তে আস্তে আসুন। মাষ্টার কুণাল এখন ঘুমুচ্ছে।

সলিল ও ইলাকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে হঠাৎ আয়া ঝড়ের বেগে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। এভাবে তাকে বেরিয়ে যেতে দেখে তারা তিনজনেই অবাক হয়ে যান।

সলিল ফাদারকে বলে, ব্যাপার কি ?

উত্তরে ফাদার বলেন, এ তো একটা রহস্য বলে মনে হচ্ছে। তবে সে বড় লাজুক। অপরিচিত লোক দেখলে লজ্জায় এতটুকু হয়ে যায়।

কিন্তু এ তো দায়িত্ব জ্ঞান হীনের পরিচয়।

ঠিক বলেছেন, কিন্তু আশ্চর্য, এই সেই আয়া, যার কথা আপনাদের বলেছিলাম।

হঠাৎ বাইরে একটা ভারী জিনিষের পতনের শব্দ কানে আসে। বারান্দায় একটা সোরগোল ওঠে।

ফাদারের সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসে সলিল ও ইলা। ছুটে পালাবার সময় বারান্দায় রক্ষিত টেবিলের কোণে আঘাত লেগে পড়ে যায় আয়া। কপালের একটা অংশ কেটে গিয়ে রক্ত পড়তে থাকে। ডাক্তার ও নার্স তাকে ধরে নিয়ে টেবিলের উপর শোয়ায়, ব্যাণ্ডেজ করে দেয়। এই দৃশ্য দেখে ফাদার ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন।

সলিল আর ইলা আয়াকে দেখে হতবাক হয়ে যায়। তারা কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে দেখে। নিজেদের চোখকেও যেন তারা বিশ্বাস করতে পারে না।

সলিল চেঁচিয়ে ওঠে, কৈলি, কৈলি বলে।

ডাক্তার তাকে নিরস্ত করেন। বলেন, ওকে বিরক্ত করবেন না।

ফাদার ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে, সলিল ও ইলার দিকে এগিয়ে আসেন। তাদের উদ্দেশ করে প্রশ্ন করেন, ডক্টর রয়, মিসেস রয়, আমি তো ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারছি না। রহস্যটা খুলে বলবেন কি ?

ফাদারকে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে সলিল নিম্নকণ্ঠে সংক্ষেপে বুঝিয়ে দেয় ব্যাপারটা। বলে, এই আয়াই মাষ্টার কুণালের মা। কিছুদিন পূর্বে সে অভিমান করে বাড়ী থেকে নিরুদ্দেশ হয়েছে।

উত্তরে ফাদার মন্তব্য করেন, সবই ঈশ্বরের লীলা।

কৈলি কতকটা সুস্থ হতেই ডাক্তারের অনুমতি নিয়ে ইলা আর সলিল তাকে গেষ্ট হাউসে নিয়ে আসে।

কৈলি তাদের না চেনার ভাণ করে।

ইলা প্রশ্ন করে, তুমি কি আমাদের চিনতে পারছ না কৈলি ?

রূঢ় কণ্ঠে উত্তর দেয় কৈলি, না। তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও, যেতে দাও।

সলিল অনুরোধ করে, ফিরে চল, আর অভিমান করে থেকো না।

ইলাও সলিলের কথার উপর জোর দেয়। বলে, লক্ষ্মী বোনটি, বাড়ী ফিরে চল।

কৈলি উত্তরে বলে, না, আমার বাড়ী নেই, ঘর নেই, কেউ নেই। ডুকরে ডুকরে সে শিশুর মত কেঁদে ওঠে।

ইলা তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে, কে বলে নেই, তোমার যা ছিল সবই আছে।

অবিশ্বাসের হাসি হাসে কৈলি। তার থেকে থেকে মনে পড়ে

রায়ভিলার সেই অতীত দিনের কাহিনী। আর কিছুদিন ঐ শিক্ষিত ভদ্র আবেষ্টনীর মধ্যে থাকলে সে হয়ত পাগল হয়ে যেত। সেই ভয়ঙ্কর পরিবেশ থেকে মুক্তি পেয়ে সে বেঁচে গেছে। সেখানে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা আর এতটুকু নেই। ইলা যতই তাকে সান্ত্বনা দিক না কেন, সে নিশ্চিত ধরে নিয়েছে, ইলা তার আসন দখল করে নিয়েছে। শুধু ভদ্রতা ও শিষ্টতার খাতিরে তাকে ফিরে যেতে বলছে। এই বিশ্বাস তার অমূলক নয়। সে নিজের কানে শুনেছে ফাদার তাকে মিসেস রয় বলে সম্বোধন করেছেন।

ইলার বুঝতে দেরী হয় না যে কৈলি তাকে ভুল বুঝেছে। সে সস্নেহে কৈলির একটা হাত ধরে বলে, আমাকে ভুল বোঝো না বোন! আমি সত্যি বলছি, তোমার স্বামী, কুণাল, রায়ভিলা, সবই তোমার আছে।

না, না, মিথ্যে কথা। চেঁচিয়ে ওঠে কৈলি।

হঠাৎ তার কি যেন খেয়াল হয়, সে ইলার সিঁথির দিকে চোখ তুলে তাকায়। এয়োতির কোন চিহ্ন সে দেখতে পায় না সেখানে। সে ভাবে, তবে কি ইলা ঠিকই বলছে! তার স্বামী আজো তার পথ চেয়ে বসে আছে। বিরাট এক সংশয় তার মনে এসে দোলা দেয়।

সলিল কৈলির কাছে সরে এসে বলে, কুণাল একটু সেরে উঠলেই তোমাকে ও তাকে নিয়ে কোলকাতায় ফিরে যাবো! আর কখনও কুণাল তোমার কাছ ছাড়া হবে না।

কয়েক মুহূর্ত কি একটু ভেবে নিয়ে সলিল কৈলিকে দুঃসংবাদটা জানায়, আজ ক'দিন হল বাবা মারা গেছেন।

এ দুঃসংবাদে কৈলির উগ্রভাবটা যেন আপনা থেকে কমে আসে। সলিল আরো কিছু বলতে চায়, ইঙ্গিতে ইলা তাকে বারণ করে। কৈলির সংশয় তখনও সম্পূর্ণ যায় না। সে আবার চেঁচিয়ে বলে, আমি আর সেই শহরের খোঁয়াড়ে যাবো না, কিছুতেই

আমাকে তোমরা বাঁচতে দাও। একা থাকতে দাও।
ইলা শান্ত কণ্ঠে বলে, খোঁয়াড় নয় বোন, এটা তোমার নিজের
ঘর। তুমি তোমার সম্পূর্ণ দাবী নিয়ে ফিরে যাবে সেখানে।
কেউ তোমাকে বাধা দিতে পারবে না। তুমি কুণালের মা। মায়ের
দাবী কেউ অস্বীকার করতে পারে না, কারো সাধ্য নেই মাতৃত্বের
অধিকার থেকে তোমাকে বঞ্চিত করার। রায়ভিলা, সলিল, কুণাল
সবই তোমার নিজস্ব।

কৈলি ধীরে ধীরে বুঝতে পারে তার ভুলটা। সে মনে মনে
অনুতপ্ত হয় তার রূঢ় ব্যবহারের জন্যে। ইলার দিকে তাকিয়ে
সজল চক্ষে বলে, দিদি আমায় ক্ষমা কর। সঙ্গে সঙ্গে সে নত
হয়ে ইলার পায়ে প্রণাম করতে যায়।

ইলা খপ করে তার হাতটা ধরে ফেলে। বলে, পাগলী
কোথাকার!

কৈলি মন্তব্য করে, আজ বুঝলাম, শহরেও সত্যিকারের মানুষ
আছে দিদি।

ইলা তাকে উপদেশ দেয়, একটা কথা মনে রেখো কৈলি, ভুল
মানুষেরই হয়।

সে কৈলিকে নিয়ে এসে সলিলের পাশে দাঁড় করায়। তারপর
একটু হেসে নিয়ে কৈলিকে অনুরোধ জানায়, অনেকদিন তোমার
সেই মিষ্টি হাসিটি দেখিনি, একটিবার হাসো দিকি।

কৈলি তার শুকনো মুখে সেই আগেকার মিষ্টি হাসিটা ফোটাতে
চেষ্টা করে।

আর অদূরে দাঁড়িয়ে ইলা একটি নিঃশ্বাস ফেলে। তৃপ্তির,
আনন্দের।
